অমরেন্দ্র ঘোষ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
কলকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন :
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

দাম ৩·৭৫ নঃ পঃ
৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৫
প্রচ্ছদশিল্পী : খালেদ চৌধুরী

ছেপেছেন :
সুনীল কুন্দগ্রামী
গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাইভেট) লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দীন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

চরকাশেম উপন্যাস হলেও আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য
সেই চরের জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষগুলির উদ্দেশ্যে

১

চর তো নয় দুধের সর।

এখনো বাঁও মেলে না—অথৈ জল—তবু ভাবে কাশেম, স্বপ্ন দেখে পাগলা। সুখের স্বপ্ন—সাধের স্বপ্ন। একদিন এ চর জাগবে। মানুষ গরু-বাছুর-হাঁস-পায়রা-মোরগে ভরে যাবে চরের বুক। মানুষের হবে ছেলে মেয়ে। গরুর হবে বকনা এবং দামড়া বাছুর। হাঁস মুরগী চারদিক ঘিরে কিলবিল করবে, কিচমিচি করবে, কদম ফুলের মত সব ছানা। আঃ কি নরম—বুক জুড়ান পাখির বাচ্চা সব।

ছোট ছোট নারকেল-সুপারির চারা। আম জাম পাকা কাঁঠালের গন্ধ। তার ভিতর এক এক চৌহদ্দিতে এক একখানা ছন কিম্বা গোলের দোচালা। উঠানে জঙ্গল। খালে কেয়া ঝাড়ের কোলে ডিঙি। ঘাটে লাজুক বৌ।

কখনো নতুন পত্তনদার ঘরে নেই। ঝড় জল—সাঁই সাঁই বাদলা হাওয়া। গাছের ডালপালা ভাঙছে। কাৎ হয়ে পড়ছে কলা ঝাড়। মা মেয়ে ভয়ে জড়ো-সড়ো। বড় গাঙের গোঙানি আর পাওয়া যায় না।

হঠাৎ খালের ঘাটে নতুন পত্তনদারের গলা।

ওরা ঝাঁপ সরিয়ে দেখে ডালা বোঝাই সওদা।

বিসমিল্লা!

চর পোক্ত হলে হাট বসবে। চাই কি গঞ্জ গড়ে উঠবে। প্রথম এক ঘর মুচি। তারপর কামার-ছুতোর-মুদী। তেল তামাকের আড়ৎ। বড় বড় নাও। চিংড়ি ইলসা শুটকি মাছের কারবারী। দালাল আসবে নানা রকম। কয়াল আসবে নানা দেশী। খরিদ হবে পাট সুপারি সরু বালাম।

গ্রীষ্ম, বর্ষা। তারপর শরৎ হেমন্ত। পূজা পার্বণ দশহরা মজলিস দাওয়াতের মরশুম। শীতে শুকনায় আনন্দ। লাঠিতে দাড়িতে তেল। নাও বাইচ—বড় খালের ওপাড় এপাড় হৈচৈ। সারা চর সরগরম। লাল নীল কাতারে কাতারে বৈঠা। সারি গান, খঞ্জরী। রাঙা মিঞা, না কালা মিঞা কে জিতবে তার জল্পনা কল্পনা। কদিন আহার নিদ্রা নেই চরের বাসিন্দাদের।

একদিন সে উত্তেজনাও কমবে।

আসবে ফকির মৌলভী—বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। কেউ খয়রাত চাইবে। কেউ দেহতত্ত্ব শোনাবে। কেউ করবে দোয়া, কেউ কামনা করবে গৃহস্থের বাড়বাড়ন্ত।

দিনে গৃহস্থালি। রাত্রে কবির পালা—জারী কীর্তন। বৌ ঝি ছেলে মেয়ে বুড়োবুড়ীর মুখে মুঠো মুঠো হাসি। চর সমেত পাগল।

আবার বর্ষা। বড় গাঙে তুফান।

হাসেমের ছেলে কাশেম—তার নামেই চরের নাম হবে। সাত গাঁয়ের লোক এপার ওপারের মাঝিরা আঙুল তুলে দেখাবে—'ঐ চরকাশেম—ঐ।'

'কই ?'

'ঐ যে।'

চরের বুকে পলিমাটি। সে তো মাটি নয়, ক্ষীর। যেমন নরম তেমনি মোলায়েম। সেই মোলায়েম মাটির কোল ঘেঁষে ঘেঁষে প্রথম জাগবে হেউলী গাছের ছোপা, তারপর জন্মাবে হোগলা পাতা—সবুজের তুলি বুলান জল ও চরের মাঝ সীমানা। হাওয়া আসবে দক্ষিণা—ঢলক খেলবে উত্তরে। হাওয়া আসবে পশ্চিমা—ঢলক খেলবে পূবে। তারপর ধীরে ধীরে জন্মাবে দু' এক ছোপা কইওকড়া ও কাশ। দুর্বার দল মাঝ চরে ঝলমল করবে আলো ও শিশিরে। চরের বুকে ও-তো শুধু দুর্বা নয়—দুর্বার বাসনা, লক্ষণ মাতৃত্বের। মৃত্তিকার গর্ভকোষে ক্রন্দন শোনা যায়। চায় পুরুষ পীড়ন—কর্ষণ ও ঘর্ষণ। নেমে পড়বে কৃষকের দল। চালাবে লাঙল, জুড়বে মই। তারপর সোনালী ফসলের অরণ্য—অনুপম লাবণ্যে ভরে যাবে চরকাশেম।

পাখি আসবে নানা রকম—কাঠ-ঠোকরাও আসবে—মাথায় লম্বা ঝুঁটি। তবে একটু দেরিতে। বড় গাছ কই ? হিজল, ছৈলা, বইন্যা ? পাখির ঠোঁটে ঠোঁটে দানা আসবে, ছড়িয়ে পড়বে এখানে ওখানে। জন্মাবে চারা গাছ ক্রমে প্রবীন প্রাচীন অশ্বত্থ, পাকুড়, আম বাবলা আরও কত কি। সে সব গাছের ডালে ডালে কত বাসা, কত পক্ষিণীর মাতৃত্বের আশা।

মানুষ আসবে, ঝাড় জংগল ভাঙবে—পশু কি দেখা যাবে না ? গৃহ পালিত পশু নয়। হিংস্র বন্য পশু। দুর্দান্ত সুন্দর বনের বাঘ, গোঁয়ার বক্রদন্ত বরাহ—জংলি ক্যাপা মোষ।

ঐ দূরের বনপথ ধরে মাঝে মাঝে তারাও আসবে। মানুষ সংগ্রাম করে

বেঁচে থাকবে, বৃদ্ধ হবে, অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলবে। কিন্তু তবু দুঃখ নেই। পিছনে পড়ে রইবে তার অপার কীর্তি।

তাদের ছেলে মেয়ে গড়বে মঠ। আকাশের বুক চিরে ঠেলে উঠবে তার চূড়া। ঘিরে রাখবে পবিত্র গোরস্থান। শান্ত সমাহিত বিগত পুরুষদের শেষ শয্যা। যেন তারা ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু এত কথা ঠিক এমন করে ভাবতে পারে না কাশেম। তবু এলোমেলো করে সে ভাবে—হঠাৎ ভুল হয়ে যায় ছিপ টানতে। বঁড়শিটা তার মাছে ধরেছিল —মাছটা বেশ বড়ই হবে। ওটার ভাগ্য ভাল তাই এড়িয়ে যায়। আর মনটা ধক-ধক করে ওঠে কাশেমের। সে ছিপটা নিয়ে ডিঙি নায়ের ওপর একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। তারপর টানতে থাকে সুতো। আশি নব্বই হাত জল। সেই জলের তলের মাছ ধরে সে দিন গুজরাণ করে। কখনো বেলে, কখনো চিংড়ি, কখনো এক রকম জলো সাপ ওঠে—তবে পোনা মাছই বেশি; ছোট বড় নানা মাপের। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত 'ডালা'—নদীর জলে তোড় থাকে কম। সেই ডালায় যাও বা ওঠে—'জো' পড়লে স্রোত চলে তরতরিয়ে, মাছ দাঁড়াতে পারে না, টোপ খায় খুব কম। তখন আর আয় থাকে না কিন্তু ব্যয় থাকে একই রকম।

মেছো হাসেমের ছেলে সে। তবু তার দেহে কৈশোর ছাপিয়ে যৌবন এসেছে। নরম হয়েছে চোখের পাতা, চঞ্চল হয়েছে চোখের তারা। সে কাকে যেন খোঁজে, কি যেন চায়! সে সাদি করবে—চর জাগলে বাড়ি বাঁধবে।

সময় সময় তার শক্ত মাংসপেশী শির শির করে। বলিষ্ঠ দেহের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ফুলমনদের বাড়ির ধার দিয়ে যখনই যায় তখনই তার মনটা হয়ে ওঠে প্রমত্ত। কিন্তু গলার স্বর অস্বাভাবিক সংযত করে ডাকে, 'ফুলমন গো—ফুলমন।'

বড় গৃহস্থের মেয়ে, খাড়ু পায় ছুটে আসে। কিন্তু বড় তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়, 'কিরে কাশমা, কি?' একটু ঢেউ দিয়ে এমন একটা টান দেয় শেষের হরফকটার ওপর যে কাশেমের মর্ম পর্যন্ত বিষিয়ে ওঠে।

পদ্মার তীরের মেয়ে—পদ্মিনীর মতই তার রং। তবে মুখখানা একটু গোল। নাকটা সামান্য চাপা, চোখ দুটো একটু ছোট। অনেকটা নেপালী মেয়েদের মত। সোনার বেসরটা নাকে সর্বদা করে ঝক ঝক। মুখখানা যেমনই হক রংয়ের দিকে চাইলে আর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তবু চুরি করে বারবার তাকিয়ে দেখে কাশেম।

এই কিছুদিন আগেও সে এই বাড়িতে বন্ধক ছিল আড়াই টাকায়। ওর যখন বয়স পাঁচ বছর তখন ওর বাপের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে—সাময়িক একটা দুর্ভিক্ষও দেখা দেয় দেশে, যে দুর্ভিক্ষ সচরাচর লেগেই আছে বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলে। ঠিক শস্যাভাবের দুর্ভিক্ষ নয়—এ দুর্দশা ভূমিহীন কৃষকের বেকার জীবনের। এক পক্ষ ব্যাপী সুদীর্ঘ বর্ষা, তাতে ঝাপ্‌টা বাতাস। নদীতে জাল ধরা যায় না। জেলেরা সব বাড়ি বসে ঝিমায়। হাসেম তার মা-মরা ছেলেকে রেখে এলো ফুলমনের মার কাছে। এবং চেয়ে আনল আড়াইটা টাকা। সে বছর আর তা শোধ করতে পারল না হাসেম। মারা গেল তিলে তিলে অল্প খেয়ে। শেষের কটা দিন সে নাকি হাঁপিয়ে ছিল।

তাই চৌকিদার তার জন্ম মৃত্যুর হাত-চিঠায় সঠিক সংবাদটাই লিখে নিয়ে গেল, মৃত্যুর কারণ—হাঁপানি।

কাশেম ফুলমনদের বাড়ি থেকেই বড় হলো। কৃষাণদের তামাক সেজে দিতে দিতে সে শিখল তামাক খেতে। পদ্মার এপার ওপার ডোঙা বাইতে বাইতে সে শিখল—ঘোর তুফানে বৈঠা ধরতে। আর সাঁতার—সে তো জানে এ অঞ্চলের কোলের ছেলেমেয়েরাও।

এই দু বছরে সে কেমন করে যেন আড়াইটা টাকা সংগ্রহ করে আনে তার এক দূর সম্পর্কের ফুফুর কাছ থেকে। টাকা আড়াইটা ফুলমনের বাপের হাতে দিয়ে বলে, 'চাচা আমি বঁড়শি বামু—বাজানের পেশা ছাড়্‌মু না।'

'সে কথা তো ভালই।'

'এখন তা হইলে রেহাই ছাও।'

'আমি তোর কাছে কি টাকা চাইছি, না তোকে আটক করছি?'

'না, তা তো করো নাই। কিন্তু ক্যান রাখুম বাজানের দেনা?'

'সাবাস বেটা! টাকা আড়াইটা লইয়া যা, বঁড়শি কিনিস। তোরে একখানা ডোঙাও দিমু আমি।'

'টাকা নিমু না আমি। তোমার মাইয়ার যে কথার ধার। আমি দিমু কিন্তু ওর থুতনি ভাইঙা।'

বৃদ্ধ সেকেলে মানুষ, রাগ করে না। বরঞ্চ বলে, 'ও হারামজাদী মুখতোড়। তুই মনি ধরিস না ওর কথা।'

কথাটা অবশ্য ধরেনি কাশেম, তা হলে কি [illegible] তখন আসতে পারে!

পদ্মা ও মেঘনা—যেন দুটি বোন। [illegible] গেছে এই মন্থর যৌবনে।

শীতের সায়াহ্ন। কতদিন পরে কত দেশ ঘুরে দেখা! কত ভাঙাগড়ার ইতিহাস দুজনার বুকে! কত আনন্দ ও বিষাদের স্মৃতি-কথা, বলবে, কেন জানি বলতে পারছে না। শুধু অন্তঃসলিলা কথার কাকলি গুমরে গুমরে মরছে বুকের পাঁজরে।

এই নদীর বুকে একখানা ডোঙায় চড়ে ছোট ছোট ঘোলায় ঘুরে ঘুরে কাশেম বড়শি বাইছে।

সে ভাবছে: সত্যি সত্যি কি আর চরকাশেম জাগবে? তার নানাভাইর নিরানব্বই কানি জলকর। ঐ তো বাঁকের মোড়ে যে সব জমি ছিল। সে তো অবোধের মত স্বপ্ন দেখে। সত্যিই কি কোনও আশা আছে? এখনও তো বাঁও মেলে না।

কিন্তু জাগতেই বা কতক্ষণ? একটু মোড় ঘুরে স্রোতটা ওপাড় ঘেঁষে চললে, এপাড়ের চর জাগবে। কীর্তিনাশা একটু মেহেরবাণী কল্লেই ওর নানাভাইর নিরানব্বই কানি ফিরিয়ে দিতে পারে এক লহমায়। এপাড় যখন ভাঙে ওপাড় তখন ভরে—এই তো নিয়ম।

আবার আশায় স্পন্দিত হয় কাশেমের বুক।

মরবে ওপাড়ের ফুলমনেরা।

তা মরুক, মরুক—ওর যেমন দেমাক!

আজ রাত্রেই সোয়াশো কানি তল-খাড়ি হয়ে ধসে যাক মেঘনায়। এপাড়ে জাগুক চর, গোছা গোছা কাশফুল ফুটবে।

কিন্তু তা নয়। ফুলমন মরলে কে ফোটাবে ফুল চর-কাশেমে? ফুলমন যেন মরে না খোদা—শুধু ওকে একটু জব্দ করে দাও।

ও বলে কিনা, 'কাশমা, তোর ছুরাৎ ছাখলে মইরা যাই। এক্কেবারে ইসকাবনের গোলাম!'

খাঁদামুখীর রংয়ের এত গরব!

একটা প্রকাণ্ড সলা চিংড়ি ওঠে। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে। মন সুস্থ করে কাশেম বঁড়শি তোলে। একটু দূরে পদ্মার ঘোলা জল ও মেঘনার কালো জল আর আলাদা করা যায় না। দুটো রং এক হয়ে শুধু আকাশের কালিমাকেই যেন গাঢ় করছে। সীমা যেন মিশে গেছে অসীমে। তার সঙ্গে ডুবে যাচ্ছে দুপাড়ের তট অরণ্য অটবী।

মিশে যাচ্ছে ডোঙা ডিঙি গয়নার নৌকা—বড় বড় মহাজনী ভরা (মাল

বোঝাই নৌকা)। শুধু দেখা যাচ্ছে তাদের বুকে ছোট ছোট বাতিগুলো—দপ দপ করছে তারার মত। অমনি ফুলমনের মুখখানা ঝিলিক দিয়ে ওঠে সেদিনের বান্দা কাশেমের বুকে। ফুলমন তো খাঁদামুখী নয়। মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে কাশেম। ওর দোষ কি?

একদিন একজন মুসাফির এসেছিল ফুলমনদের বাড়ি। সে খেতে বসবে, তার হাত ধুইয়ে দেবে কে?

'কাশেম!' ইসারা করল ফুলমনের বাপ।

কাশেম ডাবর এবং বদনা নিয়ে এগিয়ে গেল। হাত ধুইয়ে দিল অতিথির। কাশেমেরও খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। ভাবল—বসবে অতিথির একপাশে ফরাসে। কিন্তু চোখ রাঙাল পর্দার আড়াল থেকে ফুলমনের মা। 'আক্কেল নাই তোর!'

তারপরই ফুলমনের ভাই গিয়ে বসল আসরে। একটি প্রতিবাদও হলো না।

দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদল কাশেম। অবশ্য আত্মসম্মানের কথা ভেবে নয়—ক্ষিদের জ্বালায়। ওরা দুটিতে যে প্রায় সমবয়সী!

নৌকায় পাড়ি জমাতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে যায়। কাশেম লগি দিয়ে পাড়া দেয় ডোঙাটা। মাছের ডালা ও বৈঠা হাতে নিয়ে উঁচু পাড় বেয়ে উপরে ওঠে। অনেক রকম মাছ আজ সে ধরেছে। তপ্সী, মোটা মোটা সলা চিংড়ি, কয়েকটা পাংগাস। এতরাত্রে মাছ নিয়ে যাবে কোথায়? কে রাখবে? বন্দর একটা আছে বটে, কিন্তু ওর একা একা অতটা পথ যেতে ভয় করে।

কি জানি কি ভেবে তবুও উঠে পড়ে মাছের ডালা নিয়ে। খানিকটা এগিয়ে ও হঠাৎ পথের বাঁক ঘোরে। একেবারে হাজির হয় এসে ফুলমনদের উঠানে।

ফুলমন যেন প্রত্যাশা করেছিল।

'কে?'

চমকে ওঠে কাশেম। 'আমি।'

'কি তোর হাতে?'

'মাছ।'

'লইয়া আয় ইদিকে।'

'বাত্তি আন্।'

'ক্যামন মাছ?'

'মাছ আবার ক্যামন থাকে? দাড়িয়ালা।'

'এখনও তো মোচের দাগ পড়ে নাই, কথা কও দেখি পাকা পাকা।'

'বাত্তি আন—দেখাই তোরে মোচ। তুই বড় মোচের পত্তাশী মাইয়া।'

একটা কড়া চিমটি কেটে ডালাটা কেড়ে নেয় কাশেমের হাত থেকে ফুলমন।

'দরদস্তুর করলি না? দিবি কত?'

'গোলামের সঙ্গে একটা দরদস্তুর কিরে?'

'তয় লইয়া যা। তুই তো হরতনের বিবি। ঐ কয়ডা মাছ দিয়া যদি বিনা পয়সায় বিবি পাই তো মন্দ কি!'

ফুলমন ফিরে এসে চড় মারে। অমনি জড়িয়ে ধরে কাশেম। অন্ধকারে কি যে হয় ঠিক বোঝা না গেলেও এটুকু বোঝা যায় যে অনেকদিনের আক্রোশ—আজ শোধ নিয়েছে কাশেম। সে অন্ধকারে হাসতে হাসতে নায়ের দিকে ফেরে। আজ ওর দশগুণ মাছ ফাউ গেলেই বা হতো কি! হয়ত নিজের অজ্ঞাতে একটু শিউরে উঠেছিল ফুলমন। অনাস্বাদিত অদ্ভুত এক স্পর্শ!

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভিতর গেল ফুলমন। তার আভিজাত্যে আঘাত হেনেছে মেছো। কি বিশ্রী চেহারাটা—ভূতের মত। সেই ভূতের হয়েছে এমন সাহস! ফুলমন বলে দেবে তার বাবার কাছে। তার বাপ নিশ্চয়ই একটা শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বে না। এখনও যেন কাঁচা মাছের গন্ধ আসছে ওর ঠোঁট দিয়ে। ফুলমন মুখ মোছে। একবার নয়—অনেক বার। তবু সে ভুলতে পারে না—মুছে ফেলতে পারে না পুরু ঠোটের নিবিড় স্পর্শ।

সে এগিয়ে গিয়ে বাবার সামনে মাছের ডালা রাখে। মাছগুলো দেখে ভারী খুশী হয় বুড়ো। ওর মাও আসে 'কই পাইলি এত মাছ? এখনও দেখি কাঁনসি নাড়ে।'

'পাইবে কই আর—দেছে নিশ্চয় কাশমা। বড় ভালবাসে ছ্যামরা তোমার মাইয়ারে।' বলে বৃদ্ধ একবার মাছের দিকে তাকায় আবার মেয়ের দিকে। 'ওকি কান্দিস্ ক্যান? আইনা দিমু ওরে। একটু সবুর কর, ঘন ডাওর (বর্ষা) লামুক। ও থাকবে খাবে এইখানে, তার বদলে গরু চরাবে, মাছ ধরবে—ফুট-ফরমাইজ জোগাইবে তোর।—ফুলমন, ছ্যামরা খুব ভাল—নারে?'

পিতার মন্তব্য শুনে আর কোনো নালিশের কথা উত্থাপন করতে পারে না। সে শুধু চলে যাওয়ার সময় বলে, 'এখানে আইনা উঠাইলে ও শনি খেদামু আমি সোয়াশো গণ্ডা পিছা মাইরা।'

'কও কি ফুলমন! কও কি!' তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে, 'মাইয়ার তোমার মাথা খারাপ। ওরে ওঝা দেখাও। বিসমিল্লা! বিসমিল্লা!' বৃদ্ধ কোরাণ সরিফ খোলে।

বছর তিনেক বয়সের সময় ফুলমনের বিয়ে হয় এক বড়লোক ছেলের সঙ্গে। বাড়িতে হাতী ছিল—ছিল গোয়ালভরা গরু। আরও ছিল কলের গান—যা এ মুল্লুকে নেই এক হিন্দু বাড়ি ছাড়া। ছ'কি সাত বছরের সময় একবার তার শ্বশুর এসে নানা মূল্যবান কাপড় চোপড় এবং কত কি যৌতুক দিয়ে ফুলমনকে তুলে নিয়ে যায়। তখন কতটুকুই বা সে। ফুলমন কাঁদত। তাকে তার শ্বশুর ভুলিয়ে রাখত গান শুনিয়ে পুতুল খেলা দিয়ে। কত রায়ত প্রজা আসত। ওকে সেলাম করত। নজরও দিত নতুন বিবি সাহেবাকে। কিন্তু মারা গেল তার স্বামী। এখন তার আর সেখানে যাওয়া আসা নেই। বিশেষ কোন ছাপও নেই স্বামীর ঘরের। কিন্তু একটা আভিজাত্য কেমন করে যেন তার মনে সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তার বাবা ধানী গৃহস্থ—তেমন মানী নয়। ধানও বেচে, মাঠেও যায়। এসব ভালবাসে না ফুলমন। সে সর্বদা ছিমছাম হয়ে চলে। গাঁয়ের মেয়েরা তাকে হিংসা করে, বৌরা বলে বাদশাজাদী। তাকেই নজরে পড়েছে কাশেমের।

ফকির হয়ে হাত বাড়ায় আসমানে!

২

মাছ আজকাল যা পাওয়া যায় মন্দ নয়। কিন্তু তার চেয়েও ভাল হয় ধান কাটতে গেলে। প্রায় একটা সপ্তাহ পরের ওপর খেয়ে ডোঙা বোঝাই আমন ধান নিয়ে ফেরা যায় দেশে। তারপর খেটে খেলে ওটা প্রায় জমাই থেকে যায়। আর কাশেমের তো অনেক সুবিধা—তার পোষ্য বলতে আছে শুধু সে নিজে। তবে একটা সপ্তাহ হাড়ভাঙা খাটুনি। খাটতে হবে বিদেশে গিয়ে—অচেনা অজানার মধ্যে। অসুখ বিসুখ হলে দেখবার নেই

কেউ। এখানেই বা তার কে আছে? মরে যদি যায় তবুও তো এক ফোঁটা জল কেউ দেবে না! চাল এবং মাছ দিয়ে সে এক একদিন এক এক বাড়ি খায়। দেবার সময় তার যা প্রয়োজন তার অতিরিক্তই দেয়, তার ওপর রান্না না হওয়া পর্যন্ত সে বাড়ির টুকিটাকি কাজ করে দেয়—কিন্তু তবু কারুর মন পায় না। যে যা করে তা যেন নিতান্ত অনুগ্রহ। দিয়ে থুয়েও যেন সে গলগ্রহ হয়ে এ দেশটায় ঘা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের একটি নিজস্ব সংসার না থাকলে অমনি দশাই হয়। গোলামীর খাতা থেকে নাম কাটাল, কিন্তু পরের মন জোগান ছাড়তে পারলে না। এ আর কিছু নয়—তার নসিব।

'কি-ও, যাও কই—কাশেম নাকি?'

'হয় কত্তা চলছি এই দিকে। ধান কাটতে যাইতে চাই।'

'ক্যান্, তোর চরকাশেম জাগে নাই?' ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করে বুড়ো নিবারণ। 'সেই তোর নানার নিরানব্বই কানি?'

নিবারণ এখানের একজন আধা মাতব্বর গৃহস্থ। তার কিছু জমি আছে এপাড়ের চরে। তাতে বারমাস কিছু না কিছু শস্য হয়। তবে বেলে জমিতে ধান হয় না মোটেই।

'রোজ রোজ ঠাট্টা করেন কত্তা—এপারের চরে যে ভাঙন ধরছে তা তো খেয়াল করেন না।'

নিবারণের কাছে আরও তিন চারজন বসেছিল। তারা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে ওঠে, 'কও কি, কোথায় ভাঙন?' তাদের মুখ চোখে রীতিমত একটা আশঙ্কার ছাপ।

'কত্তার জমির পাশেই।'

'মিথ্যা কথা।' একজন প্রতিবাদ করে।

'হইলেও হইতে পারে।' নিবারণের ঠাট্টাও মন্দীভূত হয়ে আসে। 'কি জানি ভাই কীর্তিনাশার কি ইচ্ছা, এই বাষট্টি বছরে তিন তিনবার এপার ওপার কইরা বাড়ি বাঁধলাম।'

'ভয় নাই নিবারণ, কাশেম হাসতে আছে।'

'হাসুক তবু বিশ্বাস নাই—আমি একবার উঠুম। তোমরা এখন বাড়ি যাও—আর তামুক নাই আমার ডিবাতে।'

আলী মহাজন বড়লোক—বড় বড় নৌকাই আছে তার বিশ বাইশখানা। সে বলে, 'যদি এপার একান্তই ভাঙে কাশেম, তোর তালুকে গিয়া কবলিয়ৎ দিমু।'

'খোদার ইচ্ছা। আপনে ক্যান, কত বড় বড় মিঞা ধন্না দেবে।' একটা থিয়েটারী ভঙ্গিতে সে দাওয়া ছেড়ে রাস্তায় নামে।

কতগুলো ছোট ছোট বাচাল ছেলে ছিল সেখানে। একজন চোখের ইঙ্গিত করে। ছেলেরা অমনি চেঁচিয়ে ওঠে।

'নানার তালুক নিরানব্বই কানি।
তবু যায় না চৌক্কের পানি
ওরে কাশমা ফিইরা চা
হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।'

একটা হাসি হট্টগোল হাততালিতে কানে তালা লাগাতে চায়।

রসময় ওখানে বসেছিল। তার সম্বল মাত্র একখানা ভদ্রাসন। তার এ সব ভাল লাগে না। সে ভাবে একটা মানুষকে যে মানুষে কতখানি নাকাল করতে পারে।

কিন্তু কাশেম সত্যি সত্যিই আর ফিরে তাকায় না। কবে যেন সে গল্পচ্ছলে কার কাছে কি মন খুলে বলেছিল তারই জের। গ্রামের ভিতর তার হাঁটা দুষ্কর।

কিছুক্ষণ বাদেই সে এক মুসলমান গৃহস্থ বাড়ি গিয়ে ওঠে। এ বাড়িতে পরদা নেই, থাকবে কি করে? ভাঙাচোরা ঘর দুয়ার। ফুলমনদের মত অবস্থা থাকলে অন্দরে কেউ ঢুকতে সাহস পেত না এক কাশেমের মত ঘরের লোক ছাড়া। বৌ ঝি মেয়েরা বেশ নিঃসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকটা হিন্দু বাড়ির মত। এসব মুসলমানী প্রথামত খুবই দোষের, কিন্তু উপায় কি! দারিদ্র্য এদের অন্দরে বসে পথের লোককে যেন হানছানি দিয়ে ডাকছে।

ভূমিহীন কৃষাণ পরিবার সব আলোচনায় মগ্ন। পুরুষেরা যাবে সাত দিনের জন্য ধান কাটতে—সেই সাত দিনের ব্যবস্থা হবে কি? কেউ ধার করে চাল কিনে রেখে যাবে। কেউ গাছের ফল বিক্রি করে এ কটা দিন স্ত্রীকে চালাতে বলছে। ফলের দামে ঠিক সাত দিন চলবে না। না চলুক—তার মধ্যে মুরগী ডিম পারবে।

স্ত্রী জবাব দেয় যে গতবার সে ঐ কথায় ভুলে ঝাড়া তিন তিনটা দিন উপোস করেছে। এবার সে আর ফাঁকিতে ভুলছে না।

'তবে থাউক যাওয়া।'

'থাকবে ক্যান্? এখন যদি না জমা করেন তবে খাইবেন কি ঘনডাওরে? কথাগুলি ব্যঙ্গর মত শোনায় কিন্তু ব্যঙ্গ নয়। বিয়ে হওয়ার আগে যে

ভাইকে আঞ্জুমান তুমি বলে সম্বোধন করত, এখন তাকেই আবার আপনি বলে ডাকে দেশী রেওয়াজ অনুযায়ী। তিন তিনটা ছেলে মেয়ে এসে তাকে কুকুরের বাচ্চার মত ঘিরে ধরে। এতগুলো লোকের মধ্যে একটা টেনে তার দুধ বার করতে চায়। সেটাকে সে ঠেলা মেরে উঠানে ফেলে দেয়। জীবন-মরণ সমস্যার আলোচনা—এ সময় কি আর ভাল লাগে ছেলেমেয়ের আব্দার। 'সাত রোজ—চৌদ্দডা ওক্তো, লাগবে মাত্তর একটা টাকার চাউল। তাও যদি মরদরা জোগাড় করতে না পারে তবে সোংসার পাতা ক্যান্? মাগীগো গায়ের গন্ধ না হইলে বুঝি ঘুম আয় না?'

'চুপ কর, চুপ কর।' একজন প্রতিবাদ করে, 'চুপ কর আঞ্জুমান।'

'ক্যান্, ডর কিসের? হয় হয় বুঝছি বুঝছি—এখন আমার নাকছাবিডা যদি খুইলা দিই, আর বন্ধক থুইতে পারেন তয়, বেহেস্তের ফটক অমনে মেইলা যাইবে। নানী, ওসব হাফীজ আমার কাছে আওড়াইবা না। মুন্সী মৌলবী আর এ বাড়িতে পাও দিলে আমি তার কান কাইটা রাখুম।'

আঞ্জুমানের কথায় বাড়িসুদ্ধলোক থ' মেরে যায়। একটা পনের যোল বছরের মেয়ে বলে কি! কেউ কেউ আশঙ্কা করে যে আজ রাত্রের মধ্যেই নিশ্চয় একটা খোদার গজব ওর ওপর পড়বে। আঞ্জুমান এ বাড়িরই মেয়ে। এক চাচাতো ভাইর সঙ্গে বিয়ে হয়ে এবাড়িরই বৌ হয়েছে। তাই তার লাজ সরম একটু কম। মনে যা আসে তা সে হুট করে মুখ দিয়ে বলে ফেলে।

এক মুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে এইমাত্র মুখ ধুয়ে ফরিদ এসে সভার এক পাশে বসে। হাতে তার তামাকের সাজ-সরঞ্জাম। সে একটা তাওয়া থেকে খানিকটা তুষের আগুন তুলে কল্কিতে দিয়ে টানতে থাকে। চোখ দুটো তার রক্ত বর্ণ। শরীরের স্থানে স্থানে সদ্য ছড়ে যাওয়ার দাগ। 'কি তোমাগো কত দূর? আমার তো সব যোগাড়।'

আঞ্জুমানের স্বামী রহিম উত্তর দেয়, 'মিয়া ভাইর কথা কি—শরীর ভরা গুণ!' —অর্থাৎ সে পাকা চোর।

'তোমাগো নিষেধ করে কেউ? স্বভাব হইছে মুছুল্লির মত, শরীর হইছে বাদশার মত—পরেরটা দেইখা খালি চক্ষু টাটায়। ক্যান্ লামতে পার না আমার সাথে, ডাইকা যাই নাই আমি? কও তো নানী, আমার দোষ কি? তোর তো কোনও কষ্ট লাগত না একটু সাথে দাঁড়াইতি ক্যাবল। তিন জনে

গেছি, তিন তিন টাকা পাইছি। আরও ঘরে যা রইছে তা দুইদিন মাইয়া পোলায় তোষ মিটাইয়া খাইবে।'

'আমি তো কিছু পারি না—দিন রাত্তির কয় আঞ্জু, মধ্যে মধ্যে কও তুমি। না পারি ভালই। তুমি যে চাইর আনা পয়সা ধার নেছ হাটবার—তাই দিয়া দেও।'

'এখন হিংসা হইল বুঝি তোর! বুইন মিথ্যা কয় কি? আইজ চাইর বছর সাদি হইছে—ছাওয়াল হইল তিন তিনডা কিন্তু কাপড় দিয়া দেখছ একখানও? এই কষ্টের উপর দেলে আমিই দিছি। ভাবলাম চাচাতো ভাইরডে বিয়া দি—দেখতে শোনতে যোয়ান, খাইটা-পিটা সুখে রাখবে. বুইনডারে। তা না একটা রাঙা-মূলা!' তারপর নানীর দিকে চেয়ে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'শেষ রাত্তিরেও মিঞার উম (উত্তাপ) ভাঙে না! ডাকলে জবাব দেয় না!'

নানী বলে, 'দাদুর মাল যে এখনও টাটকা!'

'দূর, দূর, তুমি কও কি!' ফরিদ একটু লজ্জিত হয়।

সকলের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিল কাশেম। এতক্ষণ পিছন দিকে কেউ তাকিয়ে দেখেনি। 'তোমাগো কয় টাকার ঠেকা? কয়জন যাইবে মাণিকখালি ধান কাটতে? আমিও যামু কিনা তাই জিজ্ঞাসা করি।' সকলে একটু সামলে বসে। বিশেষত স্ত্রীলোকেরা। একখানা পিঁড়ি আসে কাশেমের জন্য।

মহম্মদ প্রশ্ন করে—অবশ্য ঠাট্টা করেই, 'চর বুঝি দেখায়—না হইলে দাদন দিতে চাও কিসের জোরে? গোটা সাতেক টাকা হইলে হয়। আমরা টাকা পাইলে চরকাশেমেও যাইতে রাজী। এবার খন্দ হইছে ক্যামন?'

একজন মাতব্বর গোছের লোক তার ভাঙা দাওয়ায় বসে হাঁকে, 'কি খাড়াইয়া রইলা যে—বইসো মিঞা, তামাক খাও। তামাক দে মহম্মদ, ফাইজলামি করিস পরে।'

মোট কথা এই টাকা সাতটা ধার দেওয়ার প্রস্তাব করায় মহম্মদের পিতা কেন বাড়ির সব গৃহস্থ এগিয়ে আসে। এতক্ষণ ক্রোধ, অভিমান ও অক্ষমতার যে বায়ুতে ভারাক্রান্ত হয়েছিল এই বাড়িটা তা নিমেষে কেটে যায়। একটা মুরগী জবাই দেওয়া হয় বেশ মোটা-সোটা দেখে। গত রাত্রে জেলের জাল কেটে যে মাছ চুরি করে এনেছিল ফরিদ, তার খানিকটা দিয়ে যায় আঞ্জুমানদের ঘরে। স্থির হয়েছে কাশেম গোছল করে ওদের ঘরেই খাবে। আঞ্জুমান ছেলে মেয়ে নিয়ে সবদিক সামলাতে পারে না। নানীর ডাক পড়ে। খানা প্রস্তুত হয়

হরেক রকম। সীরনি, পোলাও, কাবাব—কোনোটা বাদ যায় না। দেখতে আসে অমনি ভাত-মরা প্রতিবেশীরা। কাশেম নাতি-জামাইর মত বসে থাকে হাত পা ধুয়ে। কত রাজ্যের কত রকম ভোজের কেচ্ছা করে বুড়ো মাতব্বর গোছের ব্যক্তি। সে ছিল কেরায়া নায়ের মাঝি। দিল্লী গেছে, হিল্লি গেছে—গেছে হাবড়া, নাকি হুগলী!

টাকা তো মাত্র সাতটা। তাও দেবে ধার। তবু একটা উৎসবের সাড়া পড়ে যায় মেছো কাশেমকে ঘিরে। আজ সে আর ইসকাবনের গোলাম নয়—হরতনের টেক্কা।

একখানা হেউলী পাতার হোগ্‌লা বিছিয়ে তার ওপর সব রান্নার জিনিস রাখা হয়েছে। মেটে বাসনই বেশি। তবে দু' একখানা চিনা মাটি কিম্বা কাচের ডিসও আছে। ফরিদ কাশেম আরও কজন এসে বসে পড়ে হোগ্‌লার ওপর। অবশ্য কাশেমই জোর জবরদস্তি করে বাকী কজনকে এনেছে ধরে।

'আসেন মিঞা আসেন।'

মহম্মদের বাপের মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও মুখে সে 'না না' করতে লাগল। কিন্তু তাকে ছাড়ল না কাশেম। হিসাবের বাইরে অতিথি হয়ে গেছে, তাই চোখঠারে আঞ্জুমান নিষেধ করল স্বামীকে বসতে। কাশেম ভাতের গামলাটার দিকে চেয়ে বলল, 'হৈবে মিঞা হৈবে। গামলায় ভাত কম নাই—বসেন আইসা।'

অগত্যা রহিমও বসে পড়ল একপাশে।

ফরিদ সকলের হাত ধুইয়ে ভাত, ছালুন, মাছ গোস্ত, মেটে বাসনে ভাগ করে দিল। দুতিন জনের খানা খাবে পাঁচ ছ-জন—ভাগ করা দুষ্কর। কিন্তু তবু প্রসাদের মত পরিপাটি করে পরিবেশন করল ফরিদ। কত তার যত্ন, কত তার সম্ভ্রম বোধ!

'তুমি মিঞা পাকা খাদিমদার (পরিবেশক)।'

কাশেমের প্রশংসায় একটু হাসল ফরিদ।

প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন থেকে ভাত পর্যন্ত সকলেরই কম পড়ল। আশ্চর্য, কেউ তাতে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না। নিতান্ত ভূরিভোজের পর যেমন তৃপ্ত হয়ে ওঠে, সকলে তেমনি পরিতোষের ভাব নিয়ে আহারান্তে বাইরে এসে একটা গাছ তলায় তামাক খেতে বসল।

কম খেলো বলে দুঃখ নেই—কম তো ওরা হামেসাই খায়, কিন্তু সকলে মিলে যে একত্র বসে আহার করল এই তো পরম লাভ!

ফরিদ বলল, 'বুইনডার আমার মুখখান বড় খরখরিয়া, কিন্তু হাত খান মিষ্ট।'

একাত্তর বছরের নানী জিজ্ঞাসা করে, আর 'আমার?'

'তোমার সব্ব অঙ্গ মিঠা; তবে দুঃখের মধ্যে আমরা সোয়াদ (স্বাদ) পাইলাম না!'

এখন একটা পরামর্শ হবে, কখন কি ভাবে কোন পথে মাণিকখালি যাওয়া যাবে। কিন্তু গণ্ডগোল বাধাল ফুলমন। ফুলমনের চাচা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ। সে এসে হাজির হল সরজমিনে। প্রতিবেশী স্ত্রীলোক যারা এসেছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন গিয়ে কাশেমের টাকা ধার দেওয়ার সংবাদটা বেশ হাত নেড়ে ফলাও করে বলেছে ফুলমনের কাছে। সে কথার চেয়ে বড় কথা, আঞ্জুমান তাকে নাকি আজ বড় আদর করে নানা রকম খানা রেঁধে খাওয়াচ্ছে। গোলামকে বসিয়েছে বাদশায় আসনে। ফুলমনের মাথায় খুন চেপে গেল। সকাল বেলা জেলেরা এসে পঞ্চায়েতের কাছে নালিশ করে গেছে যে তাদের নাকি এককাছি (কুড়ি হাত) জাল চুরি গেছে। সংগে সংগে মাছও গেছে অনেকগুলো। এবার ফুলমন চাচার কানে চোরের নামটা খুব জবড়জং করে বলে এলো। 'আমাগো কাশমা—চাচা কমু কি আমাগো কাশমা! তা না হৈলে ও এত টাকা পায় কই যে আঞ্জুমানেগো ধার দেয়—এ বাড়ির থিকা গোসা কইরা গিয়া ও-বাড়িতে বইসা মেজবান (নিমন্ত্রণ) খায়, দোস্তালী পাতায়! বড় লায়েক হইছে, একটু সমঝাইয়া দেওয়া উচিত। নিন্দা হইলে তো আমাগোই হইবে।'

'কিরে কাশমা, তুই নাকি হরেন জাইলার জাল কাইটা মাছ আনছিস?'

'কইল কে এ কথা?'

মোটা বুদ্ধি পঞ্চায়েৎ বলে ফেলে, 'ফুলমন।'

'তয় হরেন বাদী না, বাদী ফুলমন? বংশে একখান মাইয়া হইছে!'

'ক্যামন?'

'মায়ের পোড়ে না, পোড়ে গিয়া মাসীর! জাল চুরি গ্যাছে হরেনের, বুক পোড়ে ফুলমনের।'

'সে তো তোর ভালর জন্য কইছে।'

'বোঝলাম, কিন্তু ওর কি? হরেন কি তোমাগো কেও হয় নাকি?'

'হইবে কিরে হারামজাদা, হইবে কি?'

'হইবে কেন, হইছে। না হইলে তোমাগো ফুলমন বাদী হয় কি উষ্টুমে (সম্পর্কে)?'

গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ—গেছে চোরা ইলিশের তদারকে। খবর পেয়ে চৌকিদার আসে। রাউণ্ডের পুলিশ দুজনও আসে হাউণ্ডের মত। এসেই বেঁধে ফেলে কাশেমকে। নিকটে ছিল ফরিদ, সেও রেহাই পায় না। দড়িদড়া কে খোঁজে? লাল পাগড়ি দিয়েই পিঠ মোড়া করে দুজনকে বাঁধে।

কি যেন বুদ্ধি দেয় মহম্মদের বাপ আঞ্জুমানকে। সে পুলিসের সঙ্গেও অনেক কেরায়া বেয়েছে কিনা! অনেক অঘটনও ঘটতে দেখেছে।

হঠাৎ একখানা দা নিয়ে লাফিয়ে পড়ে আঞ্জুমান। বাঘিনী দেখলে যেমন মেষের পাল ছত্রাকার হয়ে যায়, তেমনি চারদিকে ছুটে পালায় আহাম্মকের দল। এজাহার নেই, পরওয়ানা নেই, কিসের জোরো দাঁড়াবে ওরা?

বুড়ো তাড়াতাড়ি এসে দুজনের বাঁধন খুলে দেয়। কে যেন মন্তব্য করে, 'আঞ্জুমান একটু সুস্থ হইতেও দিল না বেচারীগো।'

এক রকম নাকে খত দিয়েই সন্ধ্যা বেলা পাগড়ি দুটো চেয়ে নিয়ে যায় একজন গ্রাম্য মধ্যস্থর মারফৎ। না দিলে ওদের চাকরি থাকবে না।

৩

সন্ধ্যার পর নদীর বুক সরগরম করে পাঁচখানা ডোঙা খোলে। দশজন কৃষাণ—ধান কাটতে চলেছে বরিশাল জেলার মাণিকখালিতে। তাদের সঙ্গে বিছানা-পত্র, হাঁড়ি-পাতিল। শীত কালের গাঙ। মরা সাপের মত। গতি আছে কি নেই বোঝা যায় না। কুয়াশাহীন পরিষ্কার আকাশ। কিন্তু কূল ছাড়িয়ে এক 'রেত' আসতেই নৌকার গতি ক্রমে বাড়তে থাকে। পাড়ি দিচ্ছে ওরা। যত মাঝ বরাবর এগিয়ে চলে ততই গতি প্রখর হয়। বোঝা যায়, মরা সাপ হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এসব ওরা আমলে আনে না।

'একটা কেচ্ছা কও—বড় শীত।'

সত্যই উত্তুরে বাতাস যেন গায়ে বরফ ছুঁইয়ে যাচ্ছে। শীত বস্ত্রেরও নিতান্ত অভাব সকলের। দুএক জনের তো গামছা গেঞ্জি মাত্র সম্বল।

একজন আরম্ভ করে, 'তয় শোনো বলি: এক যে ছিল বাদশাজাদী—গোলেবাখালি তার নাম। কন্যার ছুরাতের (রূপের) কথা কি আর কমু—আসমানের চাঁদ ছাইনা যেন গড়াইছে কন্যার দেহ—

'তারপর?'

যে গল্প বলতে আরম্ভ করেছিল, সে গান ধরে—

চিকণ চিকণ কালো চুল
(কন্যার) ভোমরার লাখান (মত) ভুরু
গালের কোলে কালা তিল
পায়ে সোণার খাড়ু…………

গান বন্ধ করে হঠাৎ সে বলে, 'এইডা কি? একটা মানুষ যে! ধর্ ধর চুলের মুঠি!'

চারদিকের নৌকা নিমজ্জমান মানুষটিকে ঘিরে ফেলে। হাতাহাতি তাকে একখানা নৌকায় তুলে নেয়। পুরুষ নয়, অপূর্ব সুন্দরী এক স্ত্রীলোক। গায়ের কাপড় পায়ে জড়িয়ে গেছে। সংজ্ঞা নেই কিন্তু নাকের কাছে হাত দিলে বোঝা যায় এখনও প্রাণ আছে। কাশেম তাড়াতাড়ি লুংগি জড়িয়ে দিয়ে ভিজা সাড়ি খুলে নেয়। গায়ের সেমিজটাও অতিকষ্টে খুলে ফেলে। তারপর উপুড় করে খানিকটা জল বমি করিয়ে শুইয়ে সেঁক দিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে তুষের আগুন রয়েছে যথেষ্ট। এ সকলই চাঁদের আলোতে করতে হয় কারণ বাতি পাবে কোথায়?

রহিম জিজ্ঞাস করে, 'নদীতে পড়ল ক্যামনে? দেইখা মনে হয় ভদ্দর লোকের ঘরের বৌ। ডাকাইতে ধরছিল বোধ হয়।'

ফরিদ বলে, 'দূর। তা হইলে কি গা ভরা গয়না থাকে?' সে ইতিমধ্যে কাশেমের নৌকায় উঠে এসে যতদূর সম্ভব তাকে সাহায্য করতে থাকে। মনে হয় সে যেন আঞ্জুমানের সেবা করছে। কাশেম যা না জানে তার চেয়ে যেন অনেক বেশি জানে ফরিদ, বলে, 'কশেম গয়নাপাতিগুলা হুঁসিয়ার, উপকারীরে কিন্তু বাঘে খায়।'

কেমন করে জলে পড়ল তাই নিয়ে অনেক আলোচনা জল্পনা কল্পনা হয়; কিন্তু কারণটা ঠিক কি, তা কেউ বলতে পারে না। ডাকাতি নয়, মৃগীর ব্যামোও নয়, কেউ যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে তাও মনে হয় না—তবে কি?

'এখন ক্যামন আছে?' কাশেম প্রশ্ন করে।

'ভাল আছে চিন্তা নাই—তুমি সুস্থ হইয়া নৌকা বাও। এই রহিম, একেবারে কালাইয়া (ঠাণ্ডা হইয়া) গেলাম একটু তামাক খাওয়াও।'

সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে ভোর হয়ে আসে। উষার রক্তোচ্ছ্বাস দেখা যায় পূর্বাচলে। সকাল বেলার দিকে বেশ ঘন কুয়াশা। সেই কুয়াশা ঠেলে জলের তল দিয়ে যেন সূর্য ওঠে। একটা রক্তগোলকের মত দূর থেকে প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ক্রমে কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আলোর মালা ছড়িয়ে পড়ে নদীর জলে। এতক্ষণে বোঝা যায় তারা কত বড় নদী পাড়ি দিয়ে এসেছে। ওপারের গাছপালা শুধু একটু ধোঁয়ার তুলি বুলান। আর সবখানি জল, শুধু জল! সময় সময় ছলবল করে ওঠে উত্তুরে বাতাসে।

মেয়েটির সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা যায়। দিনের আলোতে সকলেই বুঝতে পারে মেয়েলোকটি বিবাহিতা—হিন্দু ঘরের বৌ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফরিদের বার কয়েক বমি হয়। এ আবার কি বিপদ! কলেরা নয় তো?

ফরিদ পারে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। তাড়াতাড়ি নৌকা ভিড়ান হয়। সে একটা ঝোপের আড়াল থেকে ফিরে এসে বলে যে তার ভেদবমি হচ্ছে।

চিন্তার কথা।

সকলকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে সে বাড়ি ফেরার প্রস্তাব করে। 'আমি এখনও পায় হাইটা যাইতে পারুম। তোমরা সাবধান মত আসো গিয়া। ভাইরে, সবই নসিব।' সে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সকলে ঝিমোতে থাকে।

রহিম বলে, 'ভাইজান, ধান আগে না জান আগে? আমি তোমারে লইয়া বাড়ি ফিরুম।'

'মুখ্যু, বাড়ি ফিইরা খাবি কি: বড় মায়া ফ্যানাইতে শেখছ!'

'মিঞা ভাই, ব্যামো হইছে তবু তোমার কথার কি আল (হুল), গা জ্বইলা যায় শোনলে।' রহিম বিরক্ত হয়ে বসে থাকে।

সকলে মিলে ডাকাডাকি ও কাকুতিমিনতি করে একখানা 'যাতা' (চলন্ত) নায় তুলে দেয় ফরিদকে। সে গলুইতে উঠেই তামাক সাজতে বসে—'কাশেম

খুব হুঁসিয়ার মত যাইও—অযত্তন হয় না জানি ঠারৈণের। ওনারে লইয়া কেথায় যাবা তা তো কিছু ঠিক করলা না!'

'খোদার ফজলে যখন জেয়ান হৈছে তখন চিন্তা করা লাগবে না—তুমি সাবধান।'

ধান কাটতে এসে মাঝ পথ থেকে ফিরে চলল ফরিদ, তার জন্য সকলেই দুঃখিত। কিন্তু স্বস্তি বোধ করে যে, ওকে হেঁটে যেতে হলো না দেশে।

নৌকার চালির ওপর মেয়েলোকটি উঠে বসেছিল। শীতের রোদটা বেশ ভালই লাগছে। তাদের কথার জবাবে সে যেন একটু ম্লান সলজ্জ হাসি হাসে।

কাশেম জবাব দেয়, 'বুঝছি, বুঝছি সব।'

কিন্তু আদৌ যে সে কিছু বুঝতে পারেনি এইটুকুই রহস্য।

অনেক সময় গত হয়েছে। নদীতে এখন পূর্ণ জোয়ার—নৌকা চলছে মন্থর গতিতে। উজান বেয়ে আর কতটা এগুনো যায়!

এতক্ষণ ধরে মেয়েলোকটি বলছিল—সে কি করে অতদূর ভেসে গিয়েছিল কাল। সন্ধ্যাবেলা গা ধুতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে চলে যায় অগাধ জলে। তখন এমনি জোয়ার। ভাগ্যে এক খণ্ড কলাগাছ পেয়েছিল। কিন্তু একটা ছোট ঘোলায় পড়ে বেশিক্ষণ আর দিশা রাখতে পারেনি। তারপর পেল একখানা ভাঙ্গা নৌকার তক্তা। খানিকবাদে শীতে এবং পরিশ্রমে সেখানাও গেল হাত থেকে ফস্‌কে। তখন রাত হয়েছে অনেকটা। তারপর যে কি হয়েছে তা আর সে জানে না। জ্ঞান হয়ে দেখে, সে এই নৌকায়। বাসা তার নিকটের ঐ বন্দরটায়—একেবারে নদীর পাড়ে। দুঃসাহস করে সে স্নান করতে এসেছিল কাল একাই।

'বাসায় কত্তা নাই?'

কাশেমের প্রশ্নের উত্তরে যুবতী শুধু একটু ম্লান হাসি হাসে।

কিছু দূর যেতে না যেতেই একখানা বড় নৌকা এসে হাজির। মাঝি মাল্লা লোকজনের চেহারা দেখে বোঝা যায়—সারারাত ধরে তারা নদীর বুক পাতি পাতি করে খুঁজেছে। নৌকার গলুইতে একজন প্রৌঢ় মহাজন গম্ভীর হয়ে বসে। স্ত্রীলোকটিকে দেখে তার মনে একটা উচ্ছ্বাস এলো। কিন্তু তা সে গোপন করে, শুধু কাছে এসে নৌকা ভিড়িয়ে তাকে তুলে নেয় সযত্নে—'তুমি যে ফিরে আসবে প্রমীলা, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। পদ্মায় যারা ভেসে যায় তারা যে কেউ কখন ফিরে এসেছে তা শুনিনি। আমার ভাগ্য ভাল।'

'আর আমার ?'

'কৃষ্ণ জানেন।' প্রৌঢ় ভক্তিপ্লুত মনে দুখানা হাত কপালে ঠেকায়। তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। সবগুলো নৌকা একখানা বাসার ঘাটে গিয়ে ভেড়ে। পরিষ্কার তকতকে ঝকঝকে একখানা বাড়ি। সুন্দর একখানা দোতালা টিনের ঘর।

কাশেম একটু মুস্কিলে পড়ে। নৌকার অন্যান্য সকলের সঙ্গে একটা কানাঘুষা করে—হিন্দুনারী, কপালে সিন্দুর নেই, অথচ স্বামী আছে। বাড়ির ভিতর কেমন সুন্দর একখানা মণ্ডপ! তুলসী গাছও রয়েছে অনেকগুলো। ওদের ডেকে একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহাজনের কর্মচারীরা সংবাদ পেয়ে কাজকর্ম ফেলে সব বাড়ির ভিতর ছুটে আসে। সকল কথা রুদ্ধশ্বাসে শোনে। এবং সব শুনে কাশেমদের এমন যত্ন করে যে তা কল্পনাতীত। বাজারের সব সেরা জিনিস কেনে জগদীশ মহাজন। মুসলমান গোমস্তা ডেকে ওদের রুচিমত আহারের ব্যবস্থা করে দিতে বলে। সে একজন পরম বৈষ্ণব। সচরাচর তার পয়সায় যে সব জিনিস খরিদ করা হয় না, তাও খরিদ করা হল মুসলমান অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য।

প্রমীলাকে দেখে বাড়ির ময়নাটা নাচতে থাকে। এতক্ষণ যে বিড়ালটা মনমরা হয়েছিল, সেটা কেবল ঘুরে ঘুরে তার গা জড়াতে থাকে।

'পুলিসেও খবর দেওয়া হয়েছে।' জগদীশ বলে, তোমার গয়নাগুলো ছিল একটা গুরুতর আশংকার বস্তু। প্রভুর কৃপায় যে গুণ্ডা-যণ্ডার হাতে পড়নি—এও একটা সৌভাগ্য।'

'লোকগুলো বড় ভাল। ওরা যত্ন না করলে যে আজ কি হতো তা ভেবে পাইনে।···কিন্তু একটা দুল যে দেখছিনে। আংটিটাও যে নেই।'

'ওরা কি আর তা নিয়েছে? যদি নেবার ইচ্ছা থাকত তবে ভারী গুলোই নিত। হাত পা ছুঁড়তে কেমন করে হয়ত খুলে পড়েছে। যাক গে, ওর জন্য মন খারাপ করো না। তুমি যে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছ সেই যথেষ্ট।'

'তা ঠিক। ওদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছ?'

'সে জন্য তোমার ভাবতে হবেনা। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।'

প্রমীলা চুপ করেই বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু ওদের খাওয়ার সময় সে শারীরিক সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করে উঠে যায়। এখন আর তার গায় একখানাও

গয়না নেই তার বদলে ফোঁটা তিলক কাটা—নিরাভরণ দিব্যি এক বৈষ্ণবী মূর্তি। নিরামিষ-আহারী জগদীশও এসেছে। ধান-কাটা মজুর হলেও তাদের জন্য সকল রাজসিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যত সময় খাওয়া না হয়. তত সময় তারা করজোড়েই যেন দাঁড়িয়ে থাকে। অস্পৃশ্য আহার্য, যবন অতিথি—তবু কত প্রেম কত অনুভূতি যেন উথলে ওঠে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর হৃদয়ে!

একদিন, দুদিন, তিনটা দিনও গত হয়ে যায়, তবু জগদীশ ও প্রমীলা ওদের ছাড়ে না। একটা ছোটখাটো মহোৎসবের ব্যবস্থা হয়, কিছু দরিদ্রনারায়ণ সেবা করান হয়—হরিসংকীর্তন তো প্রত্যহ হয়েই থাকে মহাজনের গদিতে। সন্ধ্যার পর কর্মচারীরা ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ নিয়ে বসে। জগদীশ প্রকাণ্ড একজন চাল-ধান-নারকেল-সুপারীর আড়তদার। গঞ্জে তার গোলা আছে পাঁচ সাতটা। এছাড়া বাজে মালেরও বেচাকেনা আছে। জগদীশ ঢাকা জেলার মানুষ। দরিদ্র দোকানদার হিসাবে এখানে আসে। প্রথম বেচত চিটাগুড় ও তামাক। সেই রীতিটা আজও সে ছাড়েনি। স্ত্রী পুত্র দেব-সেবা সবই তার নাকি দেশে আছে—এবং তা অন্যের চেয়ে বেশ ভালই আছে। তবু তার এখানে একটা সংসার। কাশেমরা বুঝতে পেরেছে, এটা সেবাদাসীর সংসার, চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম বটে। কিন্তু সেজন্য ওদের খারাপ লাগেনি। স্নেহ মায়া মমতায় ওরা তুষ্ট হয়ে গেছে।

জগদীশ ওদের ধান কাটতে যেতে বারণ করেছে। সে বলেছে যে তার একটা পুকুর আছে মাইল তিনেক দূরে, তাতে জল আছে খুব কমই। একটু চেষ্টা করে ধরে নিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে—শোল, টাকি, বোয়াল। আর ধান কেটে যে ধান মজুরি হিসেবে পাবে তা জগদীশ ওদের দিয়ে দেবে গোলা থেকে।

পুকুরের জল ছেঁচতে মাত্র দুদিন লাগে। তারপর ডোঙায় ডোঙায় মাছ বোঝাই হয়। এখন ধান নেবে কোথায়? জগদীশ লোক ও নৌকা দেয়।

ওরা বাড়ি ফিরে চলে। কাশেমের সঙ্গে একটু বেশি আলাপ হয়েছিল প্রমীলার; সে বলে, 'যাবে তো কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখ. বাড়িটা একেবারে খালি হয়ে যাবে। হ্যাঁ কাশেম, তোমার তো শুনি কেউ নেই। থাকতে পার না এখানে? অনেক মুসলমান গোমস্তা আছে, তুমিও না হয় রইলে।'

'আচ্ছা ত্থাশে তো যাই, আবার নাইলে আসুম—ত্থাশ-বিত্থাশ আমার কাছে সোমান ঠাৱৈণ দিদি।'

যাওয়ার সময় একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে প্রমীলা, একটু কাঁদে মেছো কাশেম।

৪

ফুলমন গোমা সাপের মত মনে মনে গুমরাচ্ছিল। একবার সুমুখে পেলেই ছোবল দেবে। কিন্তু শিকার কেন জানি তাকে এড়িয়ে চলে। তার কি রাগ হয়েছে সহজে? আড়াই টাকার বান্দার এত বড় হওয়ার লিপ্সা কেন? কেন ধান এনে তুলেছে আঞ্জুমানদের ঘরে? বড় বিশ্বাসী হলো ঐ সেয়ানা মাগী—ফরিদ চোরার ভাইয়ের বৌ! আবার ও নাকি বলে বেড়াচ্ছে, চাকরি করতে গঞ্জে যাবে। 'কাশমা' করবে চাকরি! করবে গোলামি। তাই যদি করতে হয়, তবে ফুলমনদের বাড়ি থাকায় দোষ ছিল কি? ফুলমনরা ওকে তো আর চিমটি কাটত না। আর এমন কোন কাজ করাত না যাতে ওর মান যায়। এখানে তো বাড়ির একজনের মতই থাকত। শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে মেজাজ দেখাত। কোন কাজে অনিচ্ছা হলে অমনি বলত, 'না—এখন পারুম না।' গঞ্জে গিয়ে গোঁয়াতুমি চলবে না। পয়সা দিয়ে চাকর রাখবে, একটু এদিক ওদিক করলে ঘাড় সোজা করে দেবে। সেখানে মায়া মহব্বৎ নেই।

সে জোর করেও কাশেমের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। সেই কাশেম—যার সঙ্গে ফুলমন শিশু বয়স থেকে খেলাধুলো, ঝগড়াঝাঁটি করে বড় হয়েছে—যার আবদার অভিমান কাশেম জান দিয়েও রেখেছে। সেই কাশেম কি করে পর হয়ে গেল—ভুলে গেল তাদের।

ভাবতে ভাবতে ফুলমনের কাছে কাশেম রংয়ের গোলামের মর্যাদা লাভ করে। একবার যদি প্রতিপক্ষের হাতে গিয়েও থাকে, তবু ফিরিয়ে আনতে হবে যে কোনো কৌশলে!

পর্দার আড়াল থেকে ফুলমন রহিমকে দেখে তাকে ডাকে।

'একটা নারকেল পাইড়া দিয়া যাবি?'

'পাড়ুনি দিতে হইবে কিন্তু একটা।'

'একটা নারকেল পাইড়া মজুরি নিতে চাও একটা ?'

'গাছে তো ওঠাই লাগবে—একটা না পাড়াইয়া দশটা পাড়াও।'

'যাউক আমার নারকেল পাড়ান লাগবে না। তুই একটু কাশমারে পাঠাইয়া দিবি ?'

'তারেও তো তুমি কম জ্বালাও নাই। সাধে সে চইলা গেছে? এখন সে গঞ্জে চাকরি করতে যাইবে—গাছে চড়তে আর আইবে না।' রহিম ফিরে চলে।

'এই, শোন, রাগ করিস না—দিমু সেই একটাই মজুরি।'

রহিম ফিরে আসে। একটি গাছে মাত্র দুটি ঝুনো নারকেল ছিল, তাই পাড়া হয়। রহিমের কাছে সে প্রমীলার সংবাদ পায়—রূপ গুণ যৌবনের। সেবা-দাসীরা সাধারণত কোন শ্রেণীর হয় তাও সে জানে।

'তুই নারকেল দুইটা নিয়া যা—আমারে ঐ চারাগাছটা থিকা একটা ডাব শুধু পাইড়া দিয়া যা।' আজ কেন যেন তার দারুণ তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

ফুলমনের উদারতায় রহিম আশ্চর্য হয়ে যায়!

ধান যাই আসুক—ছোট ছোট পরিবারের প্রায় একমাসের খোরাকী এসেছে। যারা একটা দিন কেন, একটা বেলা নির্ভাবনায় খেতে পারে না, তারা একটা মাস নিশ্চিন্ত। একথা ভাবতে গিয়েও আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে আঞ্জুমান। একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে ত্রিশটা রোজ। হয়ত দুচার বেলা বেশিও যাবে ক্ষুদগুলো যত্ন করে রাখলে।

এরই মধ্যে সমস্ত বৌরা একত্র হয়ে বাড়ির এজমালি উঠোনখানা ভাল করে নিকিয়েছে। যে যার ভাগ আলাদা করেছে বাঁশের 'আধলা' দিয়ে। একটা উঠোন ভাগ হয়েছে অনেকটায়। তাতে ছড়িয়ে দিয়েছে সেদ্ধ ধান। শীতের তপ্ত রোদে মনে হয়, এ তো ধান নয়—সোনার দানা। ঐ ছড়ান ধানের ফাঁকে ফাঁকে পথ। আঞ্জুমান অতি সন্তর্পণে হাঁটে, তার অব্যক্ত আনন্দ উছলে পড়ে সোনালী শস্যের বুকে।

একটা মুরগী কিংবা হাঁস অথবা অন্য কোন পাখিতে একটি ধানও খেতে পারে না। বড় কঞ্চি নিয়ে বসে থাকে মেয়েরা দাওয়ায়। আঞ্জুমান রান্না চাপায় ভোর বেলা। ছেলে মেয়ে ও স্বামীকে খেতে দেয়, কাশেমকে খাওয়ায়। তারপর সারাদিন ধান নিয়ে থাকে। ঐ ধানের লাভ সবটা। তুষ, কুঁড়ো, ক্ষুদ, একটি জিনিসও সে এদিক ওদিক হতে দেবে না। তার শ্রম দিয়ে যত্ন দিয়ে চান (আয়) বাড়িয়ে দেবে অনেকখানি। সে

কাশেমের ধানও ভানবে। যে কাশেম তাদের জন্যে এতটা করেছে, তার ধান অন্য কাউকে সে ভানতে দেবে না।

মাছ যা ধরে এনেছে তা দেখে তো ফরিদের চক্ষু স্থির! ধানের কথা সে হিসেব করে রেখেছিল; কিন্তু মাছটা তো তার হিসাবের বাইরে। এনেছে নিছক বিনা মূল্যে। ফরিদ শুধু তারিফ করে, 'বাঃ—বেশ মাছ তো।' কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আর কিছু বলে না।

মনের কথাটা তার সকলে বুঝতে পারে, সকলে কিছু কিছু দেয়। তাতে দর যা পায় তা প্রায় একটা ভাগের সামিল।

এবার আর যে তার মোটেই ঠকা হলো না—তা সে হিসেব করে দেখল।

সেদ্ধ ধান শুকিয়ে মেয়েরা তুলেছে মোড়ায়—জিয়াল মাছ দিয়ে বুয়ে বাকিটা বেচে পুরুষেরা পয়সা এনেছে ঘরে। হাটবার ছেলে-মেয়ে-বৌ-ঝির কাপড় এসেছে। হয়ত সাত আট বছর পর্যন্ত যে শিশুদের গায়ে কাপড় ওঠেনি—তাদেরও এবার জামা কাপড় হলো। এবার যেন বরাত ফিরলো এদের। পাশাপাশি অন্য বাড়িগুলি শুধু শুধু জ্বলেপুড়ে মরে হিংসায়। বিষ কিছু ঢালে গিয়ে ফুলমনদের বাড়ি। একটু বেশি বিষ ছড়ায় ওহাদালীর বৌ। সে ভেবেছিল কাশেমের ধান ভেনে কিছু রোজগার করবে। কিন্তু তা তো হবে না।

সব শুনে গোমা সাপ আরও গুম মেরে থাকে।

বাড়ির মধ্যে উলংগ শুধু ফরিদের ছেলে মেয়ে। কিন্তু ফরিদ গম্ভীর। তার বৌকে বলে, 'ওগো বরাতে নাই—নয়া খাইবেই বা কি, নয়া পরবেই বা ক্যামনে। আল্লা রসুল দিন দিলে তখন দিমু খরিদ কইরা।

নয়া খাওয়া মানে নতুন চালের পিঠা খাওয়া। কিন্তু গোপনে গোপনে তারা যা খায় তা অন্যের চেয়ে ভাল ছাড়া মন্দ নয়। সকলে টের পায় কিন্তু রহস্য ভেদ করতে পারে না।

কাশেমকে এখন আর কেউ তার নানার নিরানব্বই কানি জমি নিয়ে ঠাট্টা করতে সাহস পায় না। সে নগদ টাকা ধার দেয়, ধান চাল জমায়—মান তার ক্রমে ক্রমে বাড়ছে।

দেখতে দেখতে রোজার মাস এলো।

একটা সাড়া পড়ে গেল মুসলমান সমাজে। দিনের বেলায় রান্নাবান্না বন্ধ—বন্ধ একটু পান তামাক খাওয়া পর্যন্ত। সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যাবেলা

সবাই মিলে রোজা ভাঙে। কাশেমও নমাজ পড়ে। এমন কি আঞ্জুমান পর্যন্ত নিয়মিত রোজা রাখে নমাজ করে—হাত জোড় করে খোদার কাছে প্রার্থনা করে, হে মেহেরবান খোদা! তুমি আমাকে আমার প্রতিবেশীকে, দুনিয়ার চেনা অচেনা সকলকে সুখ দাও, দৌলত দাও—দাও পরম শান্তি। তার চোখে মুখে একটা দিব্যভাব ফুটে ওঠে। সে মাদুরখানা তুলে রেখে, দু-গ্লাস সরবৎ নিয়ে এগিয়ে যায়। এক গ্লাস দেয় রহিমকে আর এক গ্লাস অতিথি কাশেমকে। চিনি কম, তেমন মিষ্টি হয়নি। তবু পরম আগ্রহে ঐ সরবৎ খেয়েই ওরা রোজা ভাঙে। এবার তবু কাশেম সরবৎ পেল—গতবার তার ত্রিশটা রোজাই ভাঙতে হয়েছে গাঙের পানি খেয়ে। দিন দিন আঞ্জুমান ওকে যেন একটা প্রীতির বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছে।

অন্যান্য ঘরেও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ থাকে কাশেমের। সাঁঝ রাতে এ ঘরে থাকলে হয়ত শেষ রাতে থাকে ওঘরে। এ দুনিয়ায় ওর ঘর নেই, আত্মীয় নেই—একথা ও মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

নমাজ-রোজায় যোগ দেয় না শুধু ফরিদ। দিনের বেলায়ও তার উনুন জ্বলে। সকলে তাকে কাফের ভেবে একপাশে ঠেলে রাখে। কোন ঘরে কেউ দাওয়াৎ পর্যন্ত করে না। কিন্তু ভাল-মন্দ রান্না হলে আঞ্জুমান ওকে কিছু না দিয়ে খেতে পারে না।

ফরিদ বলে, 'ঘরে চাউল থাকতে আবার রোজা কি? আমি রোজা করুম বর্ষাকালে।'

'কি যে কও মিঞা ভাই।' রহিম বলে, 'তুমি একেবারে কাফের হইলা!'

'এখন দুইডা ঘরে চাউল আছে—তাই বড় বড় ফুট কাটো—ভুইলা গেছো ঘন ডাওরের (বর্ষার) কথা? আষাঢ় শেরাবন ভাদ্দরের উপাস?'

'তার লাইগা বুঝি রোজা করুম না?'

'করো, করবা না ক্যান্? বছরে দুইবার আমার দেহে তকলিব সইব না। তোমাগো সহ্য হইলে করো।' ফরিদ আঞ্জুমানের একেবারে ছোট ছেলেটার হাত থেকে তামাকের হুঁকোটা কেড়ে নিয়ে নিবিষ্ট মনে টানতে থাকে।

রহিম বলে, 'মিঞা ভাই মাথা দিয়া ঠেলতে চায়—আমাগো শরিয়াৎ মানবে না, রোজা করবে না, নামাজ পড়বে না—খোদার দয়া হইবে এমনে এমনে?'

'খোদার দয়ার আশায় বইসা থাকে তোর মত আইলসায়। আমি রীতিমত মগজ ঘুরাই—সাথে সাথে মেহনত করি!'

রহিম ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দেয়, 'করতো চুরি-চোট্টামি। তোমার জন্য মুখ দেখান যায় না।'

'তুই চুপ কর, তুই বুঝিস্ কিরে হারামজাদা। যে বোঝে তার কাছে কই। কাশেম মিঞা · আচ্ছা চোর কেডা না? দারোগা পুলিস পঞ্চায়েৎ?' ফরিদ একটু জিরিয়ে নিয়ে বলে, 'আমাগো জমি নাই, জায়গা নাই, কাজ করলে কেও হক মজুরি দেয় না—আমরা যদি চুরি না করি, তয় টিক্যা থাকুম ক্যামনে?'

কাশেম বলে, 'তা যাই কও মিঞা, ঠাইরেণ-দিদির গয়না চুরি কইরা আনা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারুম না।'

'আমি কি মানুষ না? কে কইছে যে চুরি কইরা আনছি জলেডুবারি মানুষের গয়না?'

'তয় টাকা পাইলা কই? চলে ক্যেমনে?'

ফরিদ বলে যে সে যার নায়ে সেদিন এসেছে, সে বুড়ো খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। দক্ষিণে অনেক ধানী জমি আছে। সে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিছু সোনা রূপা নৌকায় নিয়ে যাচ্ছিল, কন্যাকে যৌতুক দিতে। ফরিদ তা নিয়ে এসেছে গোপনে। তাতে পেটও ভরল একটা মহা কৌতুকও হলো। 'বিশ্বাস না করো চলো রজনী স্যাকরার বাড়ি।'

'সাবাস মিঞা! খুব ভালই করছ।' কাশেম এগিয়ে এসে ফরিদকে তারিফ করে।

আঞ্জুমান প্রতিদিনের মত দু গ্লাস সরবৎ বার করে দেয়। ফরিদ উঠোনে বসেছিল অস্পৃশ্যের মত। কাশেম ডাকে, 'ফরিদ ভাই, ফরিদ ভাই, একটু সরবৎ খাও।' সে দুটো গ্লাশের সরবৎ তিনভাগ করতে যায়।

'কি কও কাশেম?'

'এই দিকে আইসো না!'

ফরিদ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

'বইসো আমাগো পাশে।'

আঞ্জুমান তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ভাগের সরবৎটুকু মিঞা ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়। লম্প জলছিল, সে আর আলোর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। তার চোখ ভরে আসে।

৫

অনেক দিন ধরে বঁড়শি নিয়ে যায় না কাশেম। ধান নিয়ে যে সে ব্যস্ত ছিল, তা নয়—একটু আলস্য হয়েছিল। তাই জিরিয়ে নিল কিছুদিন। এখন ডোঙাখানা মেরামত করা দরকার। সময় সময় সারা দিনই থাকতে হবে নৌকায়। ঝড়-তুফানে পাড়ি দিতে হবে ভরা নদী।

সে একটা গাছে ওঠে। গাব সংগ্রহ করবে। ঐ গাবের ঘন রস ও ছাই মিশিয়ে হবে নৌকা মেরামত। পথের ধারের নয়, অন্দরের পিছনের বাগানের গাছ—একেবারে ফুলমনের এলাকা। গোমা সাপ বাগানেই ঝাড়-জংগলে গুম মেরে থাকে। সে খেয়াল তো আর কাশেমের নেই। সে মহা বিপদে পড়ে। গলার আওয়াজ শুনে সে চমকে ওঠে।

'কে? কাশমা? মাছ ধরা-টরা বুঝি চুলায় গেছে—এখন ওগো সাথে মিইশা শেখছ এই সব?'

সে অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দেয়, 'কি সব?'

'এই পরের গাছের ফল মূল না কইয়া চুরি করতে।'

নগণ্য গাব। তাও আবার ফুলমনদের—যাদের বাঁড়ি সে আশৈশব কাটিয়ে গেল! এ সব ফল সাধারণত না বলেই লোকে নেয়। কাশেম সাজল চোর!

'এত যদি বুক টাটায়, তয় আর না পারলাম।'

'যা পারছ গোলাম, তার খেসারত দেয় কেডা?'

'ফুলমন তুই এখন আর ছোট না—একটু মাত্রা রাইখা কথা কইস। এ রকম আলাপ রোজ রোজ আর ভাল লাগে না।'

ফুলমন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রুখে আসে, 'তোর সাথে আলাপ কিরে —তুই কি আমার আলাপের যোগ্য? যা চোরা-চোরণীগো বাড়ি।' ফুলমনের গোলাপী রং একেবারে ঝলমল করে ওঠে। সে টান মেরে ফেলে দেয় গাবের ঝুড়িটা।

দিনের আলো, নির্জন ফল বাগিচা। হয়ত ফুলও ফুটেছে দুচারটা—গন্ধরাজ, বন-গোলাপ। কেন জানি কাশেমের তেমন রাগ হয় না। কিন্তু ভান করে অত্যধিক, 'দিলি তো ফেলাইয়া—বেশ, দে সব ফেইলা। আমি তোরে বকুম-ঝকুম না—একেবারে নিয়া যামু জংগলে। গোলেবাখানি রাজ কন্যার ছ্যামাক আজ ভাঙুম।'

ফুলমন যা চিন্তা করতে পারেনি, কাশেম তাই করে। ফুলমনকে নিজের বুকের কাছে নিবিড় করে টেনে নেয়। ঢলঢলে মুখখানা জোর করে তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে। 'কেমন ঠেকে গরবিনী ?'

ফুলমন আস্ফালন করে, কিন্তু ছাড়াতে পারবে কেন শক্তপোক্ত যোয়ানের থাবা ? সে লজ্জায় ভয়ে কেঁদে ফেলে।

'দেখ, যদি চেঁচামেচি করো, কেও শোনবে না—আর শোনলেও আমার কিছুই হইবে না। ইজ্জৎ গেলে তোর যাইবে—আমি 'কাশমা'—'কাশমা'ই থাকুম।'

'ছাইড়া দে—আর তোরে কিছু কমু না।'

'কবুল কর, নাকে খত দে।'

'কইলাম তো—ছাড় ছাড় কেডা আবার আইসা পড়ে !'

'আসবে না কেউ ! আচ্ছা ফুলমন আমারে তুই দেখতে পারিস না ক্যান ? ছোট থাকতে এমন কইরা বুকের কাছে শুইয়া কত দেখি গল্প শুনছিস, মনে আছে ?'

ফুলমন মোড়ামুড়ি করতে থাকে। কাশেমের চোখ দুটো দেখে সে অবাক হয়ে যায়। একটা অজানা সম্ভাবনায় সে শিউরে ওঠে।

কাশেম চুমো খায় ফুলমনকে। ফুলমন যেন প্রস্তুত হয়ে ছিল—পর মুহূর্তেই মুখ মোছে। কিন্তু কেমন যেন করে মনের ভিতরটা।

'এইবার নিয়া দুইবার হইল, কিন্তু তিন বারের বার যখন ধরুম তোরে, তখন লইয়া যামু এক্কেবারে নিজের কাছে ! মুখে কালি লাগছে নাকি গোলাপী রঙের কন্যার ?'

ফুলমনের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কাশেম লজ্জিত হয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। গাবগুলি কুঁড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়।

ফুলমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যোয়ান মরদ কাশেম একটা ঝড় তুলেছে তার দেহে ও মনে। একটা অবিস্মরণীয় অনুভূতিতে তার শরীর থর থর করে কাঁপে। কিন্তু ভিতরটা জ্বলে কাঠ কয়লার মত। কাশেম চলে যায়।

সারা দিন বসে সে ধীরে ধীরে নৌকা মেরামত করে। অনুভব করে চুম্বনের শিহরণ। গোলাপী ঠোঁট সে ভিজিয়ে দিয়েছে—চুর্ণ করে দিয়েছে রাজকন্যার গৌরব। কাশেম ভাবে : আহ্লাদে নিজে যদি ধরা দিত ফুলমন, তার চেয়ে শতগুণে ভাল, এই জোর জবরদস্তি করে মিলন। দিন যায় তবু তার

ক্ষিধে বোধ হয় না। সে কেবল কাজ করে চলে। তাকে যেন নেশায় পেয়েছে।

সাঁঝ হয়ে আসছে, সূর্য গড়িয়ে যাচ্ছে—লাল হয়ে এলো নদীর জল। তবু লক্ষ্য নেই কাশেমের। কত লোক এপার-ওপার হলো, কত নাও গঞ্জে ফিরে গেল, বৌ-ঝিরা স্নান করে জল নিয়ে গেল হাসতে হাসতে। পাল-ছাড়া গরু একটা ভয়ে ভয়ে জলের কাছে ঘুরল খানিকক্ষণ। তারপর পেট ভরে জল খেয়ে বাছুরটিকে সংগে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল বাঁশ বাগান ছাড়িয়ে—যেদিকে চলেছে গাঁয়ের পথ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের তলা দিয়ে। সুগন্ধ আসছে মুকুলের, গান গাইছে মধুলিপ্সু মৌমাছির দল। পৃথিবীর বুকে বসন্ত এসেছে, আকাশের গায় রং লেগেছে—সাধের নৌকা মেরামত শেষ করল কাশেম।

হাতে তার গাব লেগেছে, মুখে ও পায় লেগেছে কালি—এ সব ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে কাশেম নামে নদীর জলে। ধীরে ধীরে স্নান করে ওপরে ওঠে।

'বাজান! তোমারে খুইজা আমি হায়রান। আইজ কাইল থাকো কই? নদীর পারে ঘর করছ নাকি চর দেখার লাইগা?'

ফুলমনের পিতার প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেয় কাশেম, 'ক্যান খুঁজছ চাচা?'

এবার নানা ঝঞ্ঝাটে রোজার সময় একজনকেও দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করতে পারি নাই—আইজ কয় জনেরে কইছি। তুই একটু যাবি, দেখাশুনা করবি—যাবি তো কাশেম?'

'বাঃ যামু না ক্যান্, আমারে কওয়া লাগে? আমি তো বাড়ির ছাওয়াল?'

'মুখে তো কও, দেখলে একেবারে ভিজাইয়া দেও কথা দিয়া—তেমন হামেশা যাও-আও কই? আইজ কাইল তুই যেন কেমন হইছ।'

'চাচা, আমার দোষ কি?'

'হয় বুঝছি—মাইয়াটাই আমার মোন্দ। দেখি ওরে পার করতে পারি কিনা। সোমন্দ তো আছে গোড়া দুই হাতে। এক দল আইজ আইছেও ওরে দেখতে। আমি ওরে ভরা সংসারে দিমু না—তা হইলে ও দেবে ঘরের 'টুয়ায়' আগুন। কিন্তু যাই কও, মাইয়াডার আমায় গুণও যা আছে। ও আছে বইলা একটা দুর্বাও আমার সংসারে নড়ে না। এই তো আইজ কেডা জানি গাব পাড়তে আইছিল—তার যা হাল ও কইরা ছাড়ছে, আর কমু কি।'

'হয় চাচা, মানুষের কাছে কওয়া যায় না! আচ্ছা যাও, আমি এখনই আইলাম আর কি।'

কাশেমের বাঁকা কথা বুড়ো বোঝে না। 'তুই কিন্তু খাবি আমাগো ওখানে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

তারপর দুজন দুদিকে হেঁটে চলে।

ফুলমনের সম্বন্ধ এসেছে! কথাটা খুব ভাল লাগে না কাশেমের কাছে। কেন সম্বন্ধ এসেছে? কাশেমের কাছে কি বিয়ে দেওয়া চলে না? কাশেম কুল-মান-অর্থে খাটো? হতে পারে, কিন্তু সামর্থ্যে তো খাটো নয়। সে ঝড়ো-গাঙ পাড়ি দিতে পারে। ইচ্ছা করলে অনায়াসে ধরে আনতে পারে বড় বড় মাছ। বরাত ফিরলে, চরকাশেম জাগলে. তার মর্যাদা ফিরতে কতক্ষণ!

এ সব হয়ত চাচা তার হিসাব করে না, ভাবে: 'হাসমার পোলা কাশমা!'

এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! এত অহংকার! সে যাবে না ফুলমনদের বাড়ি! তাকে তো সম্মানিত অতিথির মত নিমন্ত্রণ করতে আসেনি—এসেছে কাজ আদায়ের ফিকিরে। কি মিষ্টি কথা, 'বাজান·· কেন হামেসা যাও-আও না?' যাবে কি কাশেম—যাবে শুধু শুধু সম্মান হারাতে! এখন আর সে নাবালক নয়। তার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে। ওদের কথায় আর কাশেম ভুলবে না।

কিন্তু কি যাদু করেছে ফুলমন! একটু বাদেই কাশেমের মনের ফোঁস-ফোঁসানি শান্ত হয়ে আসে। যে মন তার প্রতিবাদী, সেই মনই আবার তাকে ঘাড় ধরে ঠেলতে থাকে। চল চল, দেরি হয়ে যায় কাশেম। আর যাই হক বুড়ো তোকে ছেলের মতই ভালবাসে। নইলে এত খোঁজাখুঁজি করে তোকে ডাকতে আসত না। তুই ভুল বুঝিস না।

আঞ্জুমান জিজ্ঞাসা করে. 'খাবা না মাঝির পো?'

'না আমার দাওয়াত আছে।'

একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কোমরে গামছা জড়িয়ে কাশেম তাড়াতাড়ি বের হয়। যাওয়ার সময় চুলে এক কোষ তেল দিয়ে মাথাটা ভাল করে আঁচড়ায়। মুখখানা বার বার বার মাজে গামছা দিয়ে। যখন মনের মত হয় দেখতে, তখন সে বেরিয়ে পড়ে।

বাতিটা উসকে দিয়েছিল আঞ্জুমান—সে একটু কটাক্ষ করে হাসে। কাশেম তা লক্ষ্য করে না। আজ তার সময় কই?

সে ফুলমনদের বাড়ি গিয়েই হারেমে প্রবেশ করে। এখানে ফুলমনই কর্তা। তার কাছ থেকে সহজভাবেই ফরাস চেয়ে নেয়। বাইরের কাছারী বাড়িতে চাদর বিছিয়ে দেয় ফরাসের ওপর। ড়িস-পিরিচ-পেয়ালা-রেকাব এগিয়ে জুগিয়ে

দেয় ফুলমনের হাতে। সে আজ চোখে সুর্মা দিয়েছে পায় পরেছে নক্সি চটি। আলোতে ঝলমল করছে তার সাজসজ্জা। কি সুন্দর জাফরানি রঙের ওড়নাখানি!

অতিথি অভ্যাগতদের কাশেম বসতে অনুরোধ করে। সকলের খানাপিনা হয়ে যায় কিছু সময়ের মধ্যেই।

কে একজন যেন জিজ্ঞাসা করে, 'এ কে? বড় লায়েক ছ্যামরা তো।' পঞ্চাইৎ জবাব দেয়, 'আমাগো বাড়ির লোক।'

প্রশ্নকারী সরল মানুষ। ভাবে: ভাই ভাতিজা হবে হয়ত। সে খুব লক্ষ্য করে দেখে কাশেমের কাজকর্ম।

সে ফুলমনদের শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়। কিছুক্ষণ বাদে বাড়ির ভিতর বিদায় নিতে যায়। ফুলমনের কাছে খুব প্রশংসা করে কাশেমের। হ্যাঁ কাজের মানুষ বটে! দেখতে শুনতেও কেমন যোয়ান মরদ।

একটা কোর্মার ডিস নামিয়ে রেখে ফুলমন এগিয়ে আসে। 'হ্যাঁ মৌলভি ছাহেব। ও খুব কাজের লোক!'

তার কাছে বুড়ো মানুষটি প্রস্তাব করে যে তার একটি বয়স্থা মেয়ে আছে—যদি ছেলেটি ঘর-জামাই থাকে তবে ভালই হয়। পারে নাকি ফুলমন কথা-বার্তা চালাতে? 'বড় লায়েক ছ্যামরা—দেখ না চেষ্টা কইরা—যদি রাজি হয় থাকতে।

'ও যে আমাগো বাড়ির চাকর, যাবে কি কইরা? বলেন কি মৌলভি ছাহেব?'

বৃদ্ধ বলে, 'তোবা, তোবা!'

নিকটেই কাশেম ছিল। তার হাত থেকে এক সেট ডিস মাটিতে পড়ে খান খান হয়ে যায়। দাওয়াতের রোসনাই ঢিমিয়ে আসে।

রাত্রে কাশেম ভাবে: ইসলামের সরিয়াৎ অনুসারে সকলেই সমান—ভেদাভেদ নেই কোনখানে। তার নজির দেখা যায় ঈদের নামাজের খোলা ময়দানে। দেখা যায় প্রতি শুক্রবার জুম্মা মসজিদে। আর বাইরের সমাজ-জীবনে কেন এত নিষ্ঠুরতা? তবে মিছামিছি কেন তারা দোষ দেয় হিন্দু ভাইদের? আসল কথা তা নয়। সে আজ ছোট—হেতু, তার পিতার পেশা ছিল মাছ বেচা। টাল সামলাতে পারেনি, সে ওকে ফেলে গেছে পরের

হেফাজতে, আর কম খেয়ে রোগে ভুগে মরেছে নিজে। কিন্তু টাল সামলে আছে ফুলমনের বাপ, তাই ফুলমনের গর্ব।

সব টালই কাশেম সামলাবে। সে বিশ্বাস করে না যে খোদা কারুকে ছোট বড় করেছে। মানুষ মানুষকে রেখেছে খাটো করে। ইনশাআল্লার দোয়ায় সে অন্তরায় ঘুচতে কতক্ষণ। সে আজ বড় অপমানিত হয়েছে। খোদা! হে মেহেরবান আল্লা এ বৈষম্য ঘুচাও! গরিব বান্দার চরকাশেম জাগাও!

৬

সারা রাত ঘুমায় না কাশেম।

একে মনের জ্বালা তাতে পেটে পড়েনি অন্ন। সে ছট ফট করতে থাকে। কখন ভোর হবে—কখন সে বেরিয়ে যেতে পারবে নিজের খেয়াল-খুশি মত। অনেক দিন পর্যন্ত তার একটা কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে। সে ওপারের চর মাপতে যায় না। সুতোগুলোও তার জড়িয়ে রয়েছে। তার উচিত ছিল ওগুলোও ঠিকঠাক করে গাবের ছোপ দেওয়া। সে তখন তখনই উঠে শিকা থেকে একটা হাঁড়ি নামায়। যত রাজ্যের বঁড়শি ও সুতোর আধার এইটা। সুতো আছে অনেক রকম—হাতে কাটা শনের এবং কিছু পাটের। বঁড়শিও আছে নানা-প্রকার—ধনেখালির কাঁসার এবং ঘাড় বাঁকা বিলেতি। জ্যোৎস্নালোকে সে সবগুলো আলাদা আলাদা করে। ছেঁড়া সুতোয় বিষ গিঁট দেয়। গিঁট দিতে দিতে একটা প্রকাণ্ড লম্বা সুতো হয়। তার মাথায় বাঁধে কতকগুলি জালের লোহার কাঠি। তুলে দেখে কেমন ওজন হলো। বেশ আন্দাজ মত হয়েছে। জলের তোড়ে আর সহজে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এই ওজন দিয়ে ঠাওর করতে হবে জলের তলের চর। তরতর করে অবশ্য কাঁপবে। কিন্তু তবু কাশেম ঠাওর পাবে। বঁড়শি বেয়ে জল-টওয়ান (মাপা) তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

কেউ ঘুম থেকে ওটার আগেই সে তোড়জাড় করে বেড়িয়ে পড়ে। হুঁকো, কল্কি, তামাকের ডিবা—আর সঙ্গে নেয় একখানা বৈঠা। সুতোগুলো তো আগেই সাজিয়ে নিয়েছে একখানা ডালায়। মাথায় গামছার বিড়া বাঁধে। ডালাটা মাথায় তুলে বাকিগুলো নেয় দুহাতে ঝুলিয়ে।

ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে এগিয়ে চলে কাশেম।

তার যে খাওয়া হয়নি সে কথা সে ভুলে যায়। জীবন ভরে সে নদী দেখল, কিন্তু তার এখনও স্বাদ মেটেনি। সে নদীর অপূর্ব পরিবেশে মানুষ হয়েছে, গাঁয়ের আর পাঁচজনের মত সে নয়—সে সব দুঃখ জ্বালা ভুলে যায় তার ছোট্ট ডোঙাখানায় উঠে পাড়ি জমালে।···

তলতল ছলছল করছে জল। ও মুখ ধোয়। কুলকুচো করে ছড়িয়ে দেয় জল এদিক ওদিকে। রাত জেগে ওর চোখ দুটো করকর করছিল, তা ঠাণ্ডা হয় কয়েক মুহূর্তে। মন্দা মিঠা হাওয়া। সময় সময় ও বৈঠা চেপে চেয়ে থাকে ওপারের চর ও বনরেখার দিকে।

কাশেম পাড়ি দিয়ে আসে।

একি! কেমন যেন তার মনে হচ্ছে! একেবারে কূলের কাছের তলখাড়ি তো নেই। এক একবার জল সরে যাচ্ছে, আর তার কেবলই মনে হচ্ছে—ভরাট হয়ে এসেছে পাড়। একি সম্ভব? কিন্তু তাই তো মনে হচ্ছে! আবার জাগছে যেন নরম পলিমাটি আর বালি।

'খোদা! খোদা!' কাশেম চেঁচিয়ে ওঠে। তার হাত-পা কাঁপছে। সে ভুল করচে বৈঠা রাখতে, কোমরে গামছা জড়াতে। এলোমেলো হয়ে যায় সব সুতোগুলো।

কাশেম আত্মসংবরণ করে টওয়া ফেলে—একটু দূরে। স্রোতের বিপরীত মুখে সুতো চলে তরতরিয়ে। জায়গা মত এসে টওয়া থামল—একি, বাঁও যে পাওয়া যাচ্ছে।

কাশেম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টওয়া ফেলে। নদীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ সে জরিপ করে। মাপতে মাপতে বেলা হয় দুপুর, তবু মনের আবেগে সে মেপে চলে। ত্রিশ চল্লিশ হাত মেপে মেপে সে সুতোয় এক একটি গিট দেয়। মনে মনে হিসাব রাখে এক-চতুর্থাংশ নদীর। লেখাপড়া সে জানে না। খাতা কলম তার নেই; তবু সে হিসাব রাখে পাকা আমিনের মত। এ তার না রাখলে চলবে কেন? ভুলবেই বা কি করে? এ যে তার নসিবের নতুন ফয়জর (প্রভাত)।

'কি করো কাশেম?'

'কে হাফেজ নাকি? যাও কই?'

'যাই ডাউক ধরতে। ঐ হারগুজি জংগলের মধ্যে এক ঝাঁক ডাউক আইছে। তুমি একটু আয়ো না। একলা একলা বড় অসুবিধা।'

'না ভাই আমার সময় নাই।'

'ক্যান, নানার জমি জাগছে নাকি ?'

'ঠাট্টা না—সত্যই হাফেজ দেইখা যাও, বাঁও মেলছে।'

কোথায় যেন কি কাজে গিয়েছিল রসময়—দূর থেকে কথা শুনে সেও এগিয়ে আসে—'কি কও কাশেম, কও কি ?'

'দাস মশয়, বাঁও পাওয়া যায়—অনেকখানি জুইড়া চর পড়ছে।'

'কই দেখি—সমুদ্দুর সরা হল নাকি ?'

'বিশ্বাস না করেন, লাইমা আসেন নায়। তুমিও দেইখা যাও মিঞা।'

কাশেম কূলের কাছে নৌকা ভিড়ায়। ওরা দুজনেই নেমে আসে।

আগে রসময় পা ধুয়ে ওঠে, পরে হাফেজ। হাফেজই টওয়া ফেলে। ঝুপ .....

'সত্যই তো! কাশেম যা কইছে তা সত্য দাস মশয়।'

তবু রসময় বিশ্বাস করতে চায়না।

হাফেজের রাগ হয়, তার বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য নতুন একটা প্রমাণ প্রয়োগ করে। 'এই দেখেন টওয়ায় কত কাদা।'

'ও আগের কাদা।'

'হয়! সেই গল্পডা মনে পড়ে আপনার কথায়। এক শত্তুরে তার পির্তিবেশীর পুত্তুরের চাকরি হইছে শুইনা নিজের বৌরে কয়ঃ চাকরি হইলেও ও মাইনা পাইবে না। যদি মাইনা পায়, তবু ওগো সংসারে চান (আয়) দেখাবে না।' বলতে বলতে হেসে ফেলে হাফেজ। 'তোমার বরাত খোলছে, কাশেম। তোমার বরাত খোলছে।'

তবু রসময় নিঃশংসয় হতে পারে না। 'চর—না কোন ভাসা নৌকা-টৌকা ? নদীর তলে তো অমন কত ঝড়ে-ডোবা নাও ঘুরে বেড়ায়।'

'এই আঠার কানি জুইড়া পাক খাইতে আছে একখান নাও ?'

'না। একটা বহরও তো হতে পারে।'

'হাসাইলেন দাস মশয়।'

এমন সময় স্রোত মন্দীভূত হয়ে আসে। এইবার জল ঘুরবে, জোয়ার আসবে। নদী থম থম করছে।

কাশেম বলে, 'এইবার দেখেন তো আপনে নিজে ?'

দু তিনবার নিজে টওয়া ফেলে রসময় স্থির বুঝতে পারে যে, এদের কথা মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই কাশেমের বরাত খুলেছে। 'আমি বলিনি—বলিনি সেদিন। তবে এখনও দেরি আছে—ঝঞ্ঝাটও আছে বিস্তর।'

হাফেজ বলে, 'দেরি বেশি নাই—ও ঠিক কওয়া যায় না—যেমন ওপার ঘেইসা রেত চলে, তাতে একটা বছরেই চর জাইগা ওঠতে পারে। দেখেন না কেমন ভাঙতে আছে ছৈলাতালি দিয়া পুবপার ? গাঙ সোজা হইয়া যাইবে। ওপারের বাঁক থাকবে না—একেবারে সুতার মত সোজা হইয়া যাইবে।'

'বলো কি, ছৈলাতলি যদি ভাঙ্গে আমাদের উপায় হবে কি ? ছৈলাতালির সীমানায় যে আমাদের বাড়ি।' তারপর একটু থেমে রসময় বলে, 'ভাঙুক ওপার, ভরুক এপার। ওপারে আছে তো বড় একখানা ভদ্রাসন। বাকিটা তো সবই নিবারণ কুক্ষিগত করেছে। বুঝুক একবার—পরকে ঠকালে কি মজা! দেওয়া টাকা উসুল না দিয়ে, কোনও মহাজনের কি আর্জি দিতে পেরেছে ? একেবারে খতের পিঠ পরিষ্কার। কাশেম ঐ চরের জমিগুলি আমার ছিল।'

'তা ঠিক। ঐ নিবারণ ঠাকুর লোক ভাল না। বড় রক্ত-শোষা, বেসাতি ওর ঠগাঠগি।'

কাশেমের মনে এত সময় পর্যন্ত একটা কথা প্রশ্নের আকারে অস্বস্তি দিচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করে, 'ঝঞ্ঝাটের কথা কইলেন যেন কি ?'

'সরকারের কাছ থেকে পত্তন নেওয়ার অনেক জ্বালা আছে। সে তুমি বুঝবে না—আমি সব দেখে-শুনে তদ্বির করে দেব, তুমি আমাকে খানিকটা জায়গা দিও। এই কানি তিনেক। আমি কত দুঃখে আছি—জানত বাবা ?'

হাফেজ বলে, 'মন্দ কি! তুমি তো মিঞা বকলম—দাস মশয়েরে ধরো। আর আমি তো এপারেই আছি মিঞা, যদি নদীর পাড়ে আইতে পারি তয় আর সাত সরিকের বাড়িতে থাকুম না। চর পত্তন লইলে আমার কথা মনে থাকবেনি ?'

কাশেম হেসে বলে, 'আইজ যখন তোমাগো ডাইকা আনলাম—তোমরাই আমার পরথম পত্তনদার।'

রসময় বলে, 'আগের ঠাট্টা তামাসা ভুলে যাও—কত লোকে তো বোকার মত কত কি বলে।'

'আমি না আপনাগো মাছুয়া, আমি কি মনে রাখতে পারি আপনাগো রঙ্গোরস।' কাশেম আনন্দে একেবারে গলে যেতে চায়।

'তবে এখন চলো—পার হই। বেলা তো কম হলো না। কিন্তু এ সব কথা তোমরা কারুকে জানিও না। বুঝলে কাশেম—শুনছ হাফেজ—লোক জানাজানি হলে ক্ষতি হতে পারে।'

হাফেজ বলে, 'বুঝছি।'

কাশেমও মাথা নাড়ে। নৌকা খুলবে বলে ব্যাগ্রতা দেখায়—'এখন তা হইলে ওঠো মিঞা কূলে।'

'তোমরাও উইঠা আয়ো—যাবা কই এই দুফার বেলা না খাইয়া? আসেন দাস মশয়, সব জোগাড় কইরা দিমু, ক্যাবল ভাত দুইডা লামাইয়া লবেন এট্টু কষ্ট কইরা।'।

ওরা না, না করে—কিন্তু হাফেজ নাছোড়বান্দা

পরদিন রাত যখন গভীর হয়েছে, বাড়ির ওপর একটি গৃহস্থও যখন সজাগ নেই—কাশেম ও রহিম তখন বাড়ি ছেড়ে চলে। দুজনের হাতে দুখানা লাঠি। রহিমের হাতের খানা বহুদিনের প্রাচীন—প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের। ওখানা নাকি ওর দাদু ভাই দিয়ে যায় ওর বাপকে। বাপ মারা যাওয়ায় পর যখন সব জিনিসপত্র ভাগ হয়—ও ওইখানা অন্যান্য ওয়ারিশদের কাছ থেকে দাবি করে রাখে। কারণ ওর বাপ বেঁচে থাকতেই, ও তেল দিয়ে মেজে ঘসে যত্ন করত লাঠিখানাকে। পূর্বপুরুষের চিহ্ন—বড় গৌরবের বস্তু। ঐ লাঠি নিয়ে দাদু ভাই যে কত দাংগা করেছে! ছিনিয়ে এনেছে প্রতিপক্ষের নিকট হতে জলের ফসল, সে সব কাহিনী রূপকথার মত মনে হয়! ঐ পাকা বাঁশের লাঠিখানার এমন গুণ, যে ওখানা হাতে নিয়ে যে কাজে যাবে, সেই কাজেই জয় অনিবার্য।

আঞ্জুমানের একটা সন্দেহ হয়। 'কোথায় যান এই দিগ-রাত্তিরে?'

স্ত্রীলোকের কাছে গভীর বিষয় না বলাই ভাল, রহিম জবাব দেয়, 'যাই একটা গুরুতর কাজে।'

'না খাই সেও ভাল—ওসব কাজে আমাগো দরকার নাই।'

'তুমি ভাবছ কি?'

'আপনেই আগে কন না? মেয়া ভাইর যা সয়, আমাগো তা সয় না।'

'আমরা তো চুরি করতে যাই না।'

'তয় যে তেল মাখলেন সারা গায় ?'

'লাঠিটার গা বাইয়া একটু তেল পড়ছিল—তাই দাড়িতে মাখছি—দেখ তো সারা গায় তেল কই ?'

কাশেম বলে, 'আমারে কখনও চুরি করতে যাইতে দেখছ ? কি যে কও আঞ্জুমান !'

'তয় যাও কই—কইলেই পারো।'

'যাই তো রসময় দাসের কাছে—'

'চর জাগছে কিনা।' রহিম কাশেমের অসম্পূর্ণ বাক্যটি পূর্ণ করে।

'তুমি মিঞা বড় জিভ-পাতলা।'

'কইস না কেওর কাছে আঞ্জু—বড় ভুল হইয়া গেছে। মিঞা, মনে কিছু কইরো না—মাপ করো—আর অমন ঘাট করুম না।'

'আমিও তো শোনলাম।' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে ফরিদ। ঠিক একটা ভুতের মত চেহারা।

ওকে চিনতে না পারলে হয়ত ভয় পেত তিনজনেই। কিন্তু বিরক্ত হলো কাশেম। 'আইজ আর যামু না।'

ফরিদ বলে, 'তোমরা না যাও, আমি চললাম—রাইত কামাই দিলে খামু কি ? যত ঢাক গুরগুর তত নাশ, বইলা গেছে নিমাই দাস। আমি অত ঢাকা-চাপা ভালবাসি না। আরে মিঞা, গোসা কইরো না—ওঠো লও। আঞ্জু তেমন মুখ-আলগা মাইয়া না।'

কিন্তু কাশেম এত বিরক্ত হয়েছে যে আর ওঠে না। অগত্যা ফরিদ যাওয়ার সময় বলে যায়, 'তোমরা না দোয়া করো মিঞা—দোয়া করবে আঞ্জু।'

আঞ্জু সত্য সত্যই মনে প্রাণে দোয়া করে মিঞা ভাইকে। প্রার্থনা করে খোদার দরবারে, 'যে কঠিন কাজ·· •••যেন ফিইরা আয় ভালোয় ভালোয়।'

যে কথা নিয়ে এত চাপা-চাপি এত ঢাকা-ঢাকি, ভোর না হতেই সে কথাটা কেমন করে যেন গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। লোকে জেনেছে শুধু চর জাগেনি—কাশেম নিজের নামে নাকি বন্দোবস্তও নিয়ে এসেছে। এখন লোক খুঁজছে পত্তনে দেওয়ার জন্য। মানুষের কি অভাব ? প্রায় দেড়শ লোক এসে হাজির হয়েছে রহিমদের উঠানে। তবে যারা একটু সেয়ানা তারা গেছে নদীর পারে। চোখে না দেখে তারা মুখের কথা বিশ্বাস করবে না। মামুদ

মাঝি সরল লোক—একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। তার পেশা মাছ ধরা, কিন্তু সুবিধা মত একখানা ঘাট নেই যে নৌকা রাখে। বড় ছোট তার নৌকা আছে অনেকখানা। খোদার ইচ্ছায় ছেলে আছে আট নয়টি—সকলেই অগোছা, একেবারে ষণ্ডামার্কা। যখন যে কাজে কাশেম তাদের ডাকবে—তখনই তারা দৈত্যের মত এসে হাজির হবে। নতুন চরে বাড়ি বাঁধলে এমন লোকেরই দরকার। সে ইতিমধ্যেই এককুড়ি ডিম ও বড় দুটো ইঁচড় সকলের অজ্ঞাতে আঞ্জুমানের হাতে দিয়ে এসেছে : এসে একেবারে কাশেমের গা ঘেঁসে বসেছে।

'এখন লও মিঞা আপিসে।'

'আপনার কাছে কইল কেডা চাচা? এসব ফাঁকা কথা।'

'হয় মিঞা! এত বড় কথাডা ফাঁকা হইতে পারে? তুমি নিজের দর বাড়াও নাকি? এতকাল আমি মাছ বেচলাম—মাছুয়ার ভাও কি বুঝি না! সেলামি চাও, সেলামি? আরে আমার আষ্টডা পোলা—একটা কইরা সেলাম দিলে আষ্টজন রাইওৎ পাইলা—একেবারে দেওয়ের (দৈত্যের) সামিল। হকের জমি—নানার হক না জাইগা পারে?'

কাশেম মহা মুস্কিলে পড়ে। 'এসব শোনলেন কার কাছে?'

'ক্যান্—আমার ভাতিজায় কইছে।'

'সে জানল ক্যাম্‌নে?'

'নিজের চক্ষে দেইখা আইছে—প্রিবীণ (প্রকাণ্ড) চর।'

ভাতিজা বলে, 'না—আমি শুনছি চাচা, কেলি ফয়জারে।'

কাশেম প্রশ্ন করে কার, 'কার কাছে!'

'ইয়াছিন সব জাইনা আইছে—আঁন্দার থাকতে।'

'দূর মিঞা।'

তারপর কে এ সংবাদ রাষ্ট্র করেছে, খুঁজতে খুঁজতে তার একটা হদিস মেলে। কথাটা এসেছে হাফেজের স্ত্রীর কাছ থেকে। তারা নাকি রেজিষ্ট্রি করে দশকানি নিয়েছে এবং তার জন্যই কাল দাওয়াত করেছিল কাশেমকে।.....

কাশেম কিছুতেই এড়াতে পারত না—তখন তখনই কিছু না কিছু দিতে হতো মামুদকে। অন্তত প্রতিশ্রুতি তো বটেই! অন্য যারা এসেছে তাদের আর্জি তো এখনও শুনতেই দেয় নি মামুদ। এমন সময় রহমত সর্দার আসে সংবাদ নিয়ে যে চর এখনও জলের তলে। একেবারে চব্বিশ হাত সুতো না হলেও বাঁও মেলে না। রহমতের পর আরও আসে দুজন।

ভিড় ভাঙে। তামাকের ছাই জমেছে এক কাঁড়ি। এবার হাঁফ ছাড়ে কাশেম।

মামুদ উঠে অন্দরে যায়—খেজুর পাতায় ঘেরা পাছ-দুয়ারে। 'আমার বোঁচকাডা আন্ছু?'

'ঐ যে—ওতে কি না কি আছে, আমি আর ঘরে উঠাই নাই।'

'ভাল করছ মা। যত ষণ্ডা-গুণ্ডার কারবার—কাশেমডাও এমন হইল!'

তার পর অভিশাপ দিতে দিতে মামুদ বাড়ি ফেরে।

তখন না গেলেও, এক সময় কাশেম একা একাই রসময়ের কাছে যায়। যে রসময় গতকাল মোটে কিছুই বিশ্বাস করতে চায়নি, সে কাশেমকে অনেক আশ্বাস দেয়। 'চিন্তা নেই বাজান। খোদাকে ডাক। আমি একবার অমনি ভাগ্নেকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। মেঘনার জলে তার বাড়ি ঘর যায় যায়। খাঞ্জেআলীর দরগায় পাঁচ পীরের সিন্নি মানলাম। আর বলব কি? দেখতে দেখতে মেঘনা সরে গেল। মাসখানেকের মধ্যেই জাগল বিরাট চর। তুমিও একটা ফিকির করো। সংগে সংগে সদরে খোঁজ নাও।'

'সিন্নি না হয় আমি মানলাম—সদরে যাইবে কে?'

'আমি।'

'কত টাকার দরকার?'

'এই প্রায় দশ টাকা—কত রকম আজে বাজে ব্যয় আছে। তুমিও সংগে যাবে।'

'কবে যাইতে চান?'

'কাল যাও, পরশু যাও—যেদিন খুশি।'

টাকা দশটা কাশেমের কাছে দশখানা মোহরের তুল্য। তবু সে যাবে। এ অপমানের সে কিনারা করতে চায়। সে তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য খুইয়েও, নানার নিরানব্বই কানি জল চর জাগাবে। ভাগ্য তার বিপরীতমুখী। কিন্তু সে-ভাগ্যকেও সে আয়ত্তে আনবে। সিন্নি মানবে, খয়রাত দেবে—কোরাণ-সরিফ পড়াবে মৌলবী ডেকে। তবু কি তার মনের বাসনা পূর্ণ হবে না? খোদা কি দেবে না ঘর করতে? ঘর—সাধের ও সুখের ঘর। দর্পিণী ফুলমন যে ঘর আলো করে রাখবে। ফুলমন কি আসবে নিজের ইচ্ছায়? ফুলবাগিচার গুল বিলকুল ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে আসবে ও!

সন্ধ্যার পর কাশেম তাগাদা করে। বাড়ির যে সাতজন সাতটা টাকা ধার নিয়েছে, তাই দিতে বলে।

একজন জিজ্ঞেস করে, 'রহিম দেছে ?'

'তাতে তোমার দরকার কি ?' জবাব দেয় কাশেম।

'না—জিগাই তার লগে তো তোমার দহরম-মহরম বেশি।'

আঙ্গুর কানে কথাটা যায়—'তার লাইগা কি টাকা রাখুম ? আমাগো দিল অত ছোট না।'

'তা তো জানি। দিয়া দাও। মিঞার এখন ঠেকার সময়।'

'তোমার টাকাডা দেছ বুঝি—সেই লাইগা এত দরদ ?'

'আরে আমার টাকা তো যখনই চাইবে, তখনই দিমু। এখন কি দেবা তোমরা ! কও—আমিও আনি।'

'আমার হাতে তো নাই। বাড়ি আসুক দিয়া দেবে।' আঙ্গু বলে।

অমনি অন্যান্য সকলে বলে ওঠে—'আচ্ছা আমরাও তখন দিমু।'

কাশেম মুস্কিলে পড়ে। কেমন করে সে মাত্র একটা টাকা উসুল করে নেবে রহিমের কাছ থেকে ? আঙ্গু তো ওর জন্য কম করে না। 'দিতে হইলে দেও মিঞারা—রহিমের লগে পরে বুঝুম।'

সকলে বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'এক নায়ে সাত-গীত। আমরা সব বুঝি। দিয়া দে, দিয়া দে।'

মহম্মদ বলে, 'এখন এই সাত আনা আছে—নেও। বাকিডা পরে দিমু।'

কাশেম ঐ সাত আনাই হাত পেতে নেয়।

'আমার কিন্তু দেনা শোধ—আর চাইতে পারবা না।'

'বাকি নয় আনা ?'

'আহা সে তো দিমুই কইলাম।'

আরও তিন চার জনে কিছু কিছু এনে দেয়। সবশুদ্ধ তিন টাকা দুআনা উসুল হয়।

ফরিদ তার স্ত্রীর সংগে এমন একটা কলহ বাধিয়ে দেয় যে সেইটাই এ প্রসংগ থেকে বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। সদ্য সালিশীর দরকার। কাশেমকে একা ফেলে সকলে সেই দিকেই এগিয়ে যায়।

যেভাবেই হক কাশেম কয়েকদিনের মধ্যে জেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সংগে যাবে ফরিদ ও মহম্মদ।

কিন্তু একটা সংবাদ শুনে তার মাথাটা চন্‌চন্ করে ওঠে। ফুলমনের নাকি আর একটা সম্বন্ধ এসেছে; নিশ্চয়ই তারা বড়লোক—নইলে কোষ-নৌকা ভাড়া করে আসত না। এতদিন কাশেম বোঝেনি, এমন একটা বাজ শুধু তার জন্যই লুকানো ছিল আশমানে।

দেখি কেমন করে ফুলমনকে সাদী করে নিয়ে যায় ভিন্ গাঁয়ের লোক এসে? হক দশ-হাজারী মনসবদার, নয় তো বাদশা—সে খুন করবে তাকে। প্রয়োজন হলে বিষ খাওয়াবে কিংবা হাঁসুয়া চালিয়ে সাফ করে দেবে অহংকারী ঐ মেয়েটাকে।

তার হৃৎপিণ্ডের গতি দুরন্ত হয়ে ওঠে। মগজ করে টনটন। সে নদীর পারে গিয়ে উপস্থিত হয়।

জ্যোৎস্নায় দিগন্ত ছেয়ে গেছে। দূরের সাদা শুকনো বেলেচর ঝিকমিক করছে। নদীর চরের কাশবন, ঝাউঝাড় যেন নীরবে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এ নীরবতা—নদীতীরের দীর্ঘপ্রসারী বালুচরের স্বপ্নাবিষ্ট রূপ কাশেমকে সুস্থ করতে পারে না। এতদিন পরে আজ সে মর্মান্তিকভাবে বুঝেছে, ফুলমনকে ছাড়া তার জীবন বিফল। অথচ ফুলমন তাকে ভালবাসে না। হয়ত এমনই ঘৃণা করে যা তার ভাবতেও কষ্ট হয়। এতদিন গেছে খেলায় খেলায়। ফুলমন ওকে বাড়ির একটা পোষা-বাঁদরের মত নাচিয়েছে, যখন যা মুখে এসেছে তাই বলেছে। কিন্তু সে এমন বেকুফ, ভালবেসে ফেলেছে ঐ দুরন্ত মেয়েটাকে। তাকে ঘিরে রচনা করেছে তার স্বপ্নসৌধ। মতির মালার মর্যাদা, বাঁদরে নাকি বোঝে না! তবে ওর চোখে জল আসে কেন? কেন পদ্মার মত প্লাবন আসে বুকের দু-পাঁজর ভেঙে? সে ভুল করেছে, সে ভুল ভেবেছে। সে কিছুতেই পারে না ফুলমনকে বিষ খাওয়াতে অথবা হাঁসুয়া চালিয়ে খুন করতে। এতদিন কেটেছে খেলায় খেলায়, বাকি জীবনটা না হয় কাটবে তুষের আগুনের জ্বালায়। তবুও অনিষ্ট করতে পারবে না ফুলমনের। চরকাশেমে আর ওর প্রয়োজন নেই। চরকাশেম ঘুমিয়ে থাক নদীর অতল তলে।

নদী আর নদী। এপার ওপার দেখা যায় না—শুধু মাঝে মাঝে ঝকমক করে উঠছে ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে ভেঙে পড়ছে খাড়ি পাড়ে এসে। ধ্বসে পড়ছে পাড়। ভাসিয়ে নিয়ে গাছপালা। তবু লোকে ভালবাসে নদী—

ভালবাসে ঢেউ। কাশেমও কি কম ভালবাসে ছোট নায়ে পাল তুলে দুলতে? সে জানে কখনও হাতের বৈঠা একটু এদিক ওদিক হলে, একটু বেশি 'চান্নি' (চাপ) দিলে—অমনি মরণ। তবু অকারণ খেলতে ভাল লাগে।

ঐ ঢেউয়ের মতই সর্বনাশী ফুলমন তার বুকের পাঁজর তলখাড়ি করে ফেলেছে—হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে। পড়ুক ভেঙে, তলিয়ে যাক গোটা মানুষটা—দেখুক সর্বনাশী চেয়ে চেয়ে।

কাশেমকে ও কেবল বান্দা বলেই জানল। কিন্তু বান্দাও ভালবাসতে পারে তা একটিবারও ভেবে দেখল না। ওকে জব্দ করা যায়, ভাবী স্বামীর কবল থেকে ছিনিয়ে এনে। ওর কাছে অনুনয়-বিনয় নয়, ওর সংগে জোর করে করতে হয় প্রণয়। পোষ না মানলে পদ্মিনীকে পীড়ন করতে হবে। কাশেম তো দেখল, ও ভালবাসার বশ নয়—বশ শক্তি ও হিম্মতের।

সেই সময়ই হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে। সে খুশিতে হেসে ফেলে। কথা তো নয় কৌশল।

কাশেম বাড়ির দিকে ফেরে। একি! রাত ভোর হয়ে এলো? এত সময় সে আবোল তাবোল ভেবেছে, নদীর পারে পারে ঘুরেছে? পুলিশে টের পেলে তার আজ আর রেহাই ছিল না। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা ধীরে ধীরে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে এপারের কাশেমের চোখে। কাশেম শুধু ওপার নয়, আরও কিছু যেন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারছে তার মনের দিগন্তে। একখানা মুখ। সে মুখখানা তার ফুলমনের।

৭

বাড়ি ফিরে কাশেম দেখে যে কয়েকজন লাল-পাগড়ি উঠোনে বসে। তাকে দেখতে পায়নি। সে আর যাবে কোথায়? আঞ্জুর ঘরে পিছন দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে। ফরিদ উঠোনে বসে। তার হাত বাঁধা। পঞ্চায়েৎ সঙ্গে সঙ্গেই আছে। ব্যাপারটা আর তার তলিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। সেদিনের সেই পুলিশ তাড়ানোর আক্রোশ। রহিম বাড়ি নেই। বয়স্ক পুরুষ সব পলাতক। শুধু মহম্মদের বাপ আছে। আঞ্জুমানকে ওরা যে ধরেনি এই আশ্চর্য। হয়ত স্ত্রীলোক বলেই রেহাই দিয়েছে।

নিকটে কোন একটা ঘটনা হলে, সেটাকে উপলক্ষ করে পুলিশ না করতে পারে হেন কাজ নেই। কাশেম কেন, এসব কথা গ্রামের দুধের ছেলে পর্যন্ত জানে।

'পঞ্চাইত ছাহেব! বসেন, তামাক খান। হাত আমার বান্ধা—একটু আউগাইয়া জোগাইয়া লন—নিজেও খান, এই অতিথগোও খাওয়ান। এরাই তো আপনার খুঁটি।'

শপাশপ—আচমকা বেত পড়ে ফরিদের পিঠে। 'চুপ, শালা হারামী চুপ। মানীলোকের সংগে দিল্লেগি!'

বেতের বাড়িগুলো নিতান্ত অগ্রাহ্য করে আবার ফ়রিদ বলে, 'উনি আমাগো নাতি-জামাই—জিজ্ঞাইয়া দেখেন ক্ষেত্রী মহারাজ, এই দেশী চকিদার ভাইগো কাছে—শুধাশুধি মারেন ক্যান? ওনার বাপে আর আমার বাপে এক সাথে নাউয়া নৌকায় ডাকাতি করছে। ওনার মিঞার (বাবার) বুদ্ধি ছিল চিকন—সে ফাঁকে ফাকে ফান্দ এড়াইয়া চলছে—পোলাপানের জন্য বেশ জমাইয়া গেছে। আমার বাপে খাটছে জেল—মিঞার বুদ্ধি ছিল কম। তা না হইলে ওনার সাথে আমি কি পারি মস্‌করা করতে?'

পঞ্চাইত বলে, 'ওর মুখের দোষের জন্যই ও মরে।'

'হাতের দোষের কথাডা এখন আর কইতে সাহস হয় না মিঞার। ওনার বাজানেরও তো সে দোষ ছিল।'

চৌকিদার দুজনও মুখ টিপে টিপে হাসে।

ক্ষেত্রী বলে, 'এখন আর মারব না তোকে। সাচ্‌ বাত্‌ বোল। তুই চুরি করিস কেনহে? পঞ্চাইতের বাগবাগিচাকা কটহর নারিকেল কুছভি নেহি থাকে!'

'নাতি জামাইর বাগানের ভাগ তো আমরাও পাই। হিসাব কইরা দেখেন মহারাজ, সত্য কিনা? ছাহেব আপুসে দেবেন না—তাই রাত্তিরে যাই। আমার বাপেরে ঠগাইয়া সোনা-দানা সব নেছে—সাজা খাটছে বাজান। আর আইজ পঞ্চাইত সাইজা ফরিয়াদী হইয়া আইছে তোরাবজান!'

এবার ক্ষেত্রীও হাসে। 'তুই চুরি ছোড়!'

'মহারাজ, আপনারা খাবেন কি? তলবে কুলাইবে?'

'শালা ভারি পাজি।' লাঠিটা দিয়ে ক্ষেত্রী এমন একটা খোঁচা দেয় ফরিদকে, যে তার দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। চোখ দুটো তার লাল হয়ে ওঠে।

ঘর থেকে লাফিয়ে পরে কাশেম—ছুটে আসে মহম্মদের বাপ।

'তোমরা আবার অস্থির হইলা ক্যান্?' ফরিদ বলে, 'আমি লাঠির গুতায় মরুম না—আমার কলিজা বড় শক্ত। মারুক, মাইরা দেখুক, কত পারে মারতে।'

কাশেমও ধরা পড়ে। কিন্তু একটা কিছু হেস্তনেস্ত হওয়ার পূর্বেই সংবাদ আসে এখনই নৌকা খুলে ওপার যেতে হবে। পুলিস সাহেব নাকি লঞ্চ ভিড়িয়ে খবর পাঠিয়েছেন।

ফরিদ ও কাশেমকে অগত্যা ফালতু 'কেস' থেকে রেহাই দিয়ে যায় ক্ষেত্রী মহারাজের দল।

রসময় কাশেমের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু কাশেমের দেখা নেই। যার কাজ তার নেই মোটে গরজ, অন্যের মাথা ব্যথা। ক্রমে রসময় বিরক্ত হয়ে ওঠে। লাঠি ছাতি চাদর তিন চারবার হাতে নিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে, তামাক সাজতে বসে। এবার সে রীতিমত ভাবনায় পড়ে। কাশেম সত্যিই আসে না কেন? সে না এলে তার স্ত্রী সন্ধ্যামণি আর বাড়িতে তিষ্ঠতে দেবে না। কারণ সন্ধ্যামণিকে খুব ভোরে উঠে রান্না চাপাতে হয়েছে। সাধারণত সে দেরিতে শয্যা ত্যাগ করে। যা কিছু বেচারী রসময় উদরস্থ করেছে, তা সবাই উদ্গার করে দিতে হবে তার কথার খোঁচায়। খোঁচা তো নয়—সারাদিন ধরে খন্ খন্ করে কাঁসর বাজবে।

অবশেষে কাশেম আসে যাবার জন্য তৈরি না হ'য়ে। তবে মত বদলাল নাকি? ওদের তো উঠতে বসতে সাত মত।

কাশেম এসে সব খুলে বলে।

রসময় সন্ধ্যামণিকে ডেকে বলে, 'শুনলে তো সব—আমার কিন্তু কোন দোষ নেই।'

'শিব ঠাকুরের আর দোষ কি। শুধু তাণ্ডব নাচ নাচতে পারেন। বাড়ি শুদ্ধ সবাই অস্থির। যেন বাবু চাকরিতে চলেছেন।'

'না মা ঠাইরেণ, তা না ...'

'তুমি চুপ করো বাছা—তোমাকে তো বলিনি।' তারপর রসময়কে লক্ষ্য করে সন্ধ্যামণি বলে, 'কি বাতব্যাধি হলো নাকি তোমার? কাশেমকে পানের বাটাটাও এগিয়ে দিতে পার না—আহা ওকে তো বসতে দাওনি কিছু!

সাধে আমার মুখ ছোটে ? পুরুষ মানুষ যে সংসারে এমন কাছা-ছাড়া, সে সংসারে লক্ষ্মী ঠাকরুণ থাকতে পারে ?' সন্ধ্যামণি এসে কাশেমকে বসতে দেয়।

'এখন কি করতে চাও ?'

'কাইল যামু।'

'কেন, আজ ? একটা দিন দেরিতেও অনেক ক্ষতি হতে পারে।'

'আইজ যাই কি কইরা ? একটা জরুরি কাম আছে।'

'আমরা শুনতে পারি নে ?'

'না, দাস মশায় না—পরে কমু। এখন উঠি। পেন্নাম মা ঠারৈণ। কাইল কিন্তু কেলি ফয়জরে।'

'ঘরে আছ নাকি ? শুনছ তো—কাশেম তোমাকে প্রণাম করল—আমার কোন দোষ নেই। ওদের সঙ্গে আবার কাল ভোরে নাকি যেতে হবে—খুব ভোরে কিন্তু।'

'বুঝেছি—কাল রাত থাকতে আবার পিণ্ডি চড়াতে হবে এই তো ?'

এর একটু পরেই আদালতের একজন পিওন একখানা নোটিশ নিয়ে রসময়ের বারান্দায় এসে ওঠে। রসময়ের কাছে কাশেমের চৌদ্দ পুরুষের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। রসময় পিওনের জন্য যে কি করবে, তা ভেবে উঠতে পারে না। তৎক্ষণাৎ কাশেমকে সংবাদটা দেওয়ার জন্যও তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ সংবাদ নয়—কাশেমের ভাগ্যের অপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা। আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে ওঠে রসময়। পিয়নটি হিন্দু। তাকে স্নানাহার করে এখানেই বিশ্রাম করতে অনুরোধ করে।

একজন পিওন একাশি গণ্ডা পরওয়ানা নিয়ে গ্রামে বেরিয়েছে—যেন ভূপর্যটন করে ফিরেছে এমনি ওর চেহারা। পায়ের গোড়ালি ফেটে চৌচির। মাথার চুলে তেল পড়ে না ছ' মাসে। মুখ চোখের চামড়া রোদে পোড়া, কোঁকড়ান, তামাটে।

'মহাশয়ের নাম ?'

'জীবন হালদার।'

জাতিতে নমশূদ্র—এ কথাটা বুঝতে আর দেরি হয় না রসময়ের। 'দেশে তো তোমার জমি খেত আছে ?' অমনি রসময় সম্বোধনের মাত্রাটা এক ধাপ নামিয়ে দেয় ?

'নিশ্চয়। না হইলে কি এই গোলামিতে পোষায়? চাকরি ছাড়ি না একটু সুনামের আশায়। আমাগো মধ্যে তো চাকুইরা বলতে গেলে নাই।'

রসময় মনে মনে বলে, 'কি না চাকরি!' তারপর প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করে, 'হাল হালুটি তো আছে?'

'মইষের বাথান আছে দুইটা। হাল চলে কর্তা পনরখান!'

রসময় আশ্চর্য হয়ে ভাবে: তবু চাকরি করা চাই—একি মোহ! ও দেখি চৌদ্দবার কিনতে পারে রসময়কে।

'কর্তা, একজোড়া খড়ম চাই।'

'বসুন, এনে দিচ্ছি। থাকবে না কেন খড়ম গৃহস্থবাড়ি?' রসময়ের অজ্ঞাতে আবার সম্বোধনের মাত্রাটা চড়ে যায়।

রসময় নিজের খড়ম জোড়াই কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছে এনে দেয়। পুকুর ঘাট নিকটেই—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সুমুখের বারান্দায় এমন যত্ন করে আসন পেতে দেয় যে জীবন হালদার যেন বুঝতে না পারে—সে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের অস্পৃশ্য।

জীবন পিওন স্নান করে আসে।

খেতে খেতে জীবন বলে, কর্তা, চাকরি করার এইটুকু গুণ—না হইলে আপনারা ভাত দিতেন উঠানে।'

রসময় সঙ্কুচিত হয়ে কেবলই বলে, 'তা কেন...আজকাল তো...'

'চিরকালই আপনারা আমাদের ঘেন্না করেন। আর করবেনও, যদি না আমরা আপনাগো কাছ থিকা সম্মান আদায় কইরা নিতে পারি। রাগ করবেন না কর্তা, বড় যারা, সহজে তারা ছোটর দিকে ফিরাও চায় না। ক্যাবল প্রবোধ দিয়া রাখে।'

অভিযোগটা রসময়ের শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তবু রসময় মনে মনে অস্বীকার করতে পারে না। ভাবে, এ লোকটার সঙ্গে বাদানুবাদ করা বৃথা। কারণ বহুস্থান ঘুরে ঘাগী হয়ে গেছে।

যা হক পিওন আহারান্তে শয্যা গ্রহণ করে। রসময় কাশেমের খোঁজে যায় কিন্তু কাশেমের খোঁজ কেউ দিতে পারে না। লোকটা হাওয়া হয়ে গেল নাকি?

যে ফুলমন এই কদিন আগে দিব্যি গোলাম বলে পরিচয় দিয়ে অনায়াসে

অপমান করল কাশেমকে, সেই ফুলমনের বিয়ের অতিথকে মনোরঞ্জন করতে এগিয়ে যায় কাশেম। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

'খাসি না আইনা খাওয়াইলে কুটুম খুশী হইবে না চাচা—আর তোমার বড় মাইয়ার সোম্বন্ধ!'

'কথাডা ঠিক কইছ। মাইয়ার পরিজনের আয়-ব্যয় দেইখাই তো কাজ করে বুদ্ধিমানে। তুই না আইলে এসব বুদ্ধি দিত কেডা?'

'কুটুম্বগো বাড়ি কই?'

'চাহার—একেবারে হক সাহেবগো বাড়ির কাছে!'

'তয় তো বড় কুলীন।'

'দেখ না কোষ-নাও?'

'দেখছি চাচা। সত্য কথা কইতে গেলে তোমাগো পোছে না ওনরা। মাইয়া দেখছে?'

'না, আইজ দেখবে—খানাপিনার পর।'

'আইজ তো খাওয়াইতে হয় দিশামত।'

'কি যে কও—দিশামত খাওয়ায় তো মাইরা। আবার ওরা কেও শুইনা না ফেলে।'

'বেয়াইর লগে একটু মসকরা করলে দোষ কি?'

'যা, যা বাইচলামি করা লাগবে না, এখন একটা খাসি কি বকরী লইয়া আয়।'

'দাম দস্তুর? তুমি যাবা না?'

'তোরে কি অবিশ্বাস করি? ফুলমনও যা, তুইও আমার তা।'

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা খাসি আসে—ভোম্বল দাস। কাশেম একখানা ছুরি এনে 'বিছমিল্লা' বলে গলায় বসিয়ে দেয় আড়াই পোঁচ। রক্ত ছোটে ফিনকি দিয়ে। মাত্র কণ্ঠনালী পর্যন্ত কেটেছে।

ফুলমনের বাপের চার বিয়ে। এক এক বিবি এক এক কিশিম রান্না চাপায় মাংস দিয়ে। ছোট বিবির বয়স অল্প—প্রায় ফুলমনের সমবয়সী কিন্তু রাঁধতে জানে হরেক রকম। একটু ঠাট্টা তামাসাও করে সতীনের মেয়েকে।

কাশেম লক্ষ্য করে ফুলমনের মুখখানা একটু ভার। আজ আর ফুলমন তেমন সাজ গোছ করে নি। কারণ কি? বংশমর্যাদায় জামাই শ্রেষ্ঠ। হয়ত চাকরিবাকরিও করে ভাল। তবে একটু দেখতে রোগা, এই যা। এই সামান্য

কারণেই কি ওর মন খারাপ ? চেয়ে দেখে কাশেম—সাহস করে তার মুখোমুখি চোখ মেলতে পারে না—চেয়ে দেখে দূর থেকে চুরি করে। কী অপূর্ব রূপ, যেন পরী। হয়ত অনেক দোষত্রুটি আছে মুখখানায় কিন্তু সে সব খুঁটিনাটি ত্রুটি ধরতে পারে না বান্দা !

এক সময় ফুলমনের নজরে পড়ে। সে আজ আর কিছু বলে না কাশেমকে। তার বুকে যেন একটা তুফান চলছে।

খাওয়াদাওয়ার পর মেয়ে আসে পানদানী নিয়ে অতিথিদের সুমুখে। একখানা গিনি নজর দিয়ে বরপক্ষ মেয়ে দেখে। হ্যাঁ রূপসী মেয়ে বটে। যার যা ইচ্ছা সে তা জিজ্ঞাসা করে। ফুলমন ভার ভার জবাব দেয়।

কাশেম সর্বদা পান তামাক জোগায়—এগিয়ে জুগিয়ে দেয় ফর্সির নলটা পর্যন্ত।

বরপক্ষ শিক্ষিত বলে এই সুযোগে শা নজরের (শুভ দৃষ্টির) কাজটা হাসিল করেন। মেয়েপক্ষ থেকে অনেক বাদানুবাদ হয়েছিল, তাদের পক্ষে মোল্লা মৌলভি জুটেছিল তিন চার জন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহাল রইল বরপক্ষের মাতব্বরি।

ফুলমন বাড়ির ভিতরে চলে যায়। যাওয়ার সময় সে এমন দিশাহারা হয়ে যায় যে জরীর নকসি চটি জোড়া পড়ে থাকে সভায়। সে গিয়ে একটা আলাদা কোঠায় খিল এঁটে দেয়।

ঠিক সেই সময় কাশেম চটিজোড়া নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে 'ফুলমন, ফুলমন ! তোমার জুতা।'

'বাইরে রাইখা যাও।' তার গলার স্বর যেন ভেজা ভেজা।

কাশেম বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে।

ফুলমনের ব্যবহারে একটা অস্বাভাবিক হাওয়া সৃষ্টি হয়েছে বরপক্ষের মনে। তারা রওনা হবার পূর্বে নিগূঢ়ভাবে কারণ অনুসন্ধানে লেগে যায়। নিশ্চয়ই মেয়ের কোন দোষ আছে—গোপন করছে কন্যাপক্ষ। এখন সঠিক ঘটনাটাই তো বিদেশে জানা মুস্কিল।

কাশেম ইচ্ছা করেই যেন বরপক্ষের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। বরপক্ষও তাকেই উপযুক্ত লোক ভেবে ডেকে নৌকায় নিয়ে যায়। বাড়ির চাকর—জানে সব।

বরের পিতা জিজ্ঞাসা করে, 'একটা কথার জবাব দিবা ?'

কাশেম বোকার মত হাসে।

'কও তো মেয়েটি কেমন?'

সে উত্তর না দিয়ে আবার হাসে।

'বইসো বইসো—ঐ টুলটায় বইসা বল। আমরা কেউকে কিছু জানামু না—তোমার ভয় নাই।'

কাশেম সসংকোচে টুলটায় বসে পড়ে।

'মাইয়ার কি কোন অসুখ বিসুখ আছে?'

সে মাথা নাড়ে।

'মাথা-টাথা তো খারাপ নয়? যেমন করল তখন!'

কাশেম মাথা নাড়ে কিন্তু আবার হাসে।

সন্দেহটা দৃঢ় হয় বরের বাপের।

'তবে ব্যাপারটা কি? বল না, এইখানে কেউ বাজে লোক নাই।'

তবু কাশেম দ্বিধা করে এবং পূর্বের মতই একটু বোকা বোকা হাসে।

বরের বাপ সকলকে দূরে সরে যেতে বলে। তারা কোষ-নৌকার একেবারে ভিন্ন কামরায় চলে যায়। 'এখন কও তো।'

'মাইয়া আমাগো খোজা'।

তৎক্ষণাৎ নৌকা খোলার হুকুম হয়। 'এরা ডাকু, খোজা বেইচা পণ লইতে চায় হাজার টাকা। কয় যে মস্ত কুলীন। খোজা আবার কুলীন হইল কবে?'

কাশেম পাড়ে উঠে এবার বিদ্রূপের হাসি হাসে।

কিন্তু কিছু দূর গিয়ে ভাবে, এ দুনিয়ায় ফুলমনের মত মেয়ে পাওয়ার জন্য জন্য অনেক ছেলেই উদগ্রীব হয়ে আছে। সম্বন্ধ তো আরও আসতে পারে।

৮

'কই, দাস মশাই, আপনার কাশেমতো আইল না? আমি এখন আর দেরি করতে পারি না। নোটিশটা গরজারী দিয়াই দিতে হইল।'

'আজ রাতটা না হয় এখানেই কাটিয়ে গেলেন।'

'গেলে দোষ হইত না—কিন্তু আপনাগো পাঁচ বাড়ি ঘুইরাই আমাগো পেট

চলে। আইজকার দিনটা তো নিরামিষই গেল, আবার কাইলকারটাই বা মাটি করি ক্যান্?'

'কাশেম জাত জেলে—দেখা হলে আর আমিষের অভাব হত না।'

তল্পিতল্পা গুটিয়ে জীবন হালদার নামতে যাচ্ছিল দাওয়া থেকে, অমনি কাশেম এসে হাজির।

রসময় বলে, 'এই যে,! তোকে খুঁজে মরছে চরের কাগজ নিয়ে এসে, আর তুই ঘুরছিস ডালে ডালে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'ফুলমনদের বাড়ি। তার বিয়া কিনা!'

'ও! ঠিক হয়ে গেছে সব? ভাল ভাল। যাক্—তুই যে আমাকে ছাই-ভস্ম কি সব মেপে দেখালি সেদিন?'

'ক্যান্, ক্যান্? ছাই-ভস্ম কন ক্যান্?'

'তোর নানার চর অনেকদিন জেগে গেছে—একেবারে শক্ত মাটির চর। ঐ নদীর এক বাঁক ভাঁটিতে।'

'কি কইলেন দাস-মশয়, আমার নানার নিরানব্বই কানি? কই এখন একটু দেখাইবেন?'

'ঐ দেখ। কই হালদার মশাই তল্পি তল্পা নামান—কাগজগুলো কোথায়?'

'ইনি কেডা?'

'সরকারী পিওন?'

'আদাব। আদাব।' কাশেম উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে, কি যেন আছে ঐ পুঁটলিতে। কি যেন অনবদ্য আশীর্বাদ! বহু আকাঙ্খিত মনোবাঞ্ছা!

জীবন একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'এই নাকি আমার আসামী? বেশ, বেশ —নজর কই? ভেট বেগার তো বইতে পারুম না—রোক নগদ নজর চাই। বাবা, তোমার নানার নামে এ জমিটা ছিল। ঐ ডাকিনী কবে যে গ্রাস কইরা ভাইঙা তলাইয়া নিয়া গেছিল তা আমি বলতে পারুম না—সে সব কাগজ অবশ্য আমাগো অফিসে আছে—তবে তোমরা তো আর জলকর দাও নাই, তাই ওসব খাস হইয়া গেছে সরকারে। এই কবছর হয়, ডাকিনী আবার খুশী হইছে—ওপাড়ের সব জায়গা জমি তার কবল থিকা মুক্তি দিয়া এপারের দিকে রোখ করছে। তাই চর জাগছে অসংখ্য। লপ্ত সারবন্দী সব চর। সরকার ওয়ারিশদের ডাইকা সব চর বন্দোবস্ত দেবে—তুমিও নিতে পার, এই নোটিশ।'

'কত টাকা লাগবে? কয় কুড়ি?'

—৪

'সরকারে দিতে হবে দুইশ—আর আমারে যা খুশি। কেও দশও দেয়, কেও পাঁচ দেয়—যেমন দান তেমন দক্ষিণা।'

পিওনেরা সাধারণত মানচিত্র নিয়ে আসে না। জীবন হালদার পাকা লোক। কেমন করে যেন একটা মানচিত্র সংগ্রহ করে এনেছে। ঐটা দেখিয়ে মক্কেলের মগজের ভিতর একেবারে তার স্বার্থটা ঢুকিয়ে দিয়ে আলগোছে হাত পাতে। অমনি সহজেই তার হাতখানা ভরে যায়।

কাশেমকে জীবন বোঝায় ঃ—

'এই দেখো, উত্তরে দক্ষিণে চইলা গেছে ডাকিনী। দুইকূলের যে কত কীর্তি ধ্বংস কইরা আইছে কীর্তিনাশা তার ইয়ত্তা নাই। এইখানে রাজা রাজবল্লভের একুইশ রত্ন আছিল—তা দেখছ? তোমরা দেখবা কি কইরা, তোমরা তো নিতান্ত ছেইলা মানুষ।'

কিসের কথা কইলেন? একুইশ রত্তন? দেখুম কি কইরা—আমাগো নসিব মন্দ না হইলে ছোট কালে কি মরে বাপ? এই এতড়ুক থাকতে।' হঠাৎ কাশেমের চোখে জল আসে।

'তোমরা দেখ নাই আর দেখবাও না—শোন তবে'—জীবন মানচিত্রের বুকে আঙুল চালিয়ে দেখাতে থাকে—বলতে থাকে পূর্ববাঙলার রাজা রাজরা হিন্দু-মুসলমান ভুঁইয়া বাদশার কীর্তি কাহিনী। এই ডাকিনীর খাড়া পাড়ে কত দেবালয়, দেউল, মসজিদ এবং মন্দির ছিল—তা রাক্ষুসী গিলে খেয়েছে। কত মনুষ্য বসতি ছিল, ছিল কত কল-কোলাহল মুখরিত জনপদ। আজ তা তলিয়ে গেছে ঐ ক্ষুধিতার অতল গর্ভে। কোথাও বা ছিল জনশূন্য প্রাচীন ঐতিহ্যের মনোরম নিদর্শন। সে সব আজ আর নেই। একুশ রত্নের মধ্যমণিতে জ্বলত নাকি কূলহারা নাবিকের জন্য নিশানী আলো। সে আলোও নিবে গেছে। কিন্তু নিবে যেতে পারেনি জীবন পিওনের মন থেকে কোন স্মৃতি। সে কি না জানে? সে নিজের কথা কাশেমের কথা ভুলে গিয়ে এমন এক অপূর্ব যুগের মনুষ্যলোকে সকলকে নিয়ে যায়, এমন ভয়াল মধুর ও করুণ করে সে সব কীর্তি ও ঐতিহ্যের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে বলে যে রসময় ও কাশেম কখনও আনন্দে কখনও গর্বে অধীর হয়ে ওঠে। মধুর বিয়োগান্ত রাগিনীর মত জীবন পিওনের শেষ কথাগুলি তাদের কানে বাজে।

হিন্দু-মুসলমান দুটি পূর্ববাঙলার বন্ধু সম্প্রদায়ের একই মণিকোঠায় সে সম্পদ ছিল, তা আজ আর নেই—সবই অতলে তলিয়ে গেছে!

রসময় তামাক সাজার কথা ভুলে যায়—কাশেম চুপ করে থাকে।

'কি ভাবছ মিঞা? দুঃখু কইরো না। যা গত তা ভুলতে হইবে। কীর্তিনাশা ক্যাবল ধ্বংসই করে নাই—আবার তো ফিরাইয়া দিতে আছে অসংখ্য চর। সেই চরে তোমরা এক হইয়া গিয়া বসতি কর—মসজিদের পাশে মন্দির গড়ো—নতুন বুনিয়াদ হউক মানুষের। যারা নদীপথ দিয়া যাইবে এ সব কীর্তি তারাও দেখবে—আবার মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়বে নতুন নতুন কেচ্ছা। মানুষের কীর্তি সাধ্য কি ধ্বংস করে কীর্তিনাশা?'

রসময় বলে, 'বুঝলাম তো সবই কিন্তু কোথায়ই বা সেই রাজবল্লভ কোথায়ই বা সেই বারভুঁইয়া? প্রাচীন মাল মসল্লাই বা কই?'

'দাস মশয়, আমার বয়স প্রায় আশির কোঠায় পড়ল। পনর বছর পণ্ডিতী করছি, তারপর চাকরি করি এই চল্লিশ বছর। অনেকই তো দেখলাম, শোনলামও অনেক—রাজা বাদশার যুগ আর ফিরা আসবে না—কারণ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ লোকে আর ভালবাসে না। কাজেই এখন যাঁরা আছেন, নামেই বাইচা আছেন। আইছে নতুন যুগ—নতুন মানুষ। সমাজের তলানী থিকা ভাঙা চুড়া মানুষগুলা সিধা হইয়া দাঁড়াইছে। সে যুগের পত্তন করবে এই হাসেম কাশেম রসময় জীবন হালদারের ছেইলা মাইয়ারা।' একটু থেমে জীবন পিওন বলে, 'আমি একলা একলা আমার এই পুঁটলিটা বগলে লইয়া যখন দেশময় ঘুইরা বেড়াই, তখন এই সব কথাই ভাবি আর দিব্য চক্ষে দেখি নতুন দিনের আলো।'

জীবন পিওন এবার একটা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষের ছাপ ফেলে রসময়ের মনে। তার ইচ্ছা করে ওর পায়ে ধুলো নিতে। কাশেম সব বোঝে না, কিন্তু ভাবে এ পিওন না পয়গম্বর?

রসময় তামাক সেজে এবার তার হুঁকোটাই জীবনের হাতে দেয়। জীবন এতক্ষণ তামাক খেয়েছে হাতে। তাই লজ্জায় 'না' 'না' করতে থাকে—কিন্তু রসময় তাকে ছাড়ে না। কাশেমকে একটা ভিন্ন হুঁকো এগিয়ে দেয়।

তামাক খেতে খেতে জীবন বলে, 'ও হুঁক্কাও এক হইয়া যাইবে।'

'বলেন কি হালদার মশাই, বলেন কি?'

'বড় আঘাত পাইলেন দাস মশয়, না? কিন্তু সব গরিবের হুঁক্কা এক করতেই হইবে। তা না হইলে এমন একটা দিন আসতে আছে যে তাদের টিঁইকা থাকা দুষ্কর হইবে—'

অনেক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। পল্লীগ্রামের গাছ-পালার মধ্যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে নিবিড় হয়ে। সেদিকে লক্ষ্য নেই কারুর। একটা বাতি পর্যন্ত জ্বালিয়ে আনতে ভুলে গেছে রসময়। সন্ধ্যামণি তো নিজের ঘরের লক্ষ্মীর আসনের কাছে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাতে গিয়ে অনেক মধুর বচন শুনিয়েছে লক্ষ্মী দেবীকে। রসময়ের ঘরে লক্ষ্মী নিতান্ত অচলা তাই চুপ করে সইছেন এসব !

অন্ধকার দাওয়ায় বসে লোকগুলি যেন স্বপ্ন দেখে। দুএকটা জোনাকী জ্বলে আর নেবে। ঝিঁঝিঁর ঐকতান শুরু হয় চারিদিকের ঝোপে-ঝাড়ে। ফলন্ত গাছের ডালে ডালে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানর শব্দ। তাদের ক্ষুধিত চিৎকার বিদীর্ণ করে গ্রামের শান্ত পরিবেশ।

জীবন পিওন বলে চলে—

'বাইনা আর মুদীতে গ্রাস করেছে রাজস্ব—বন্ধক রাখছে, কবলা করছে বড় বড় জমিদারি। তারা এক হইয়া ফসল কিনতে আছে। ধান-চাউল-তেল-তামাকের দাম বাড়াইতে আছে—শুইষা নিতে আছে হিন্দু-মুসলমান খরিদ্দারগো। ট্যাস্‌কো বসায় সরকার, ভার বয় রসময় ও রাশেদ। গাধারে লাইগা তো বোঝা আর সেয়ানের লাইগা ক্যাবল মজা। সেই বাইনারাই আবার নানা ভোল বদলাইয়া ঢুইকা পড়েছে নানা প্রেতিষ্ঠানে। আমাদের শত্তুর বড় সেয়ান। অতএব, দাস মশয়, এক হুঁক্কা না হইয়া আর উপায় কি ?'

রসময় কল্কিটা চেয়ে নিয়ে আবার তামাক সেজে জীবনের হাতে দেয়। জীবন পিওন গুড়ুক গুড়ুক করে টানে। শেষকালে সে বলে, 'দল বাইন্ধা চললে বউন্যা শূয়ারেরও দাঁত ভাঙা শক্ত না—বোঝলেন দাস মশয় ?'

যাবার সময় জীবন পিওন নোটিশটা দিয়া বলে,—'এই তো নোটিশ। আপনারা সদরে যাইবেন। একেবারে খাস মহলের ডিপটি এজলাসে। কিছু বেশি নিয়া যাইবেন, না হইলে নাতি জামাইগো তুষ্ট করতে পারবেন না। অনর্থক কাজে দেরি হইয়া যাইবে। হয়ত আর একজন হাসেমের পুত্তুর কাশেম গজাইয়া ওঠবে রাতারাতি—সদ্য কাটা কলাগাছের মাইজের মত।'

কাশেম একটা ময়লা গামছার খোঁট খোলে। 'কিছু নিবেন না ?'

ভাল করে কাশেমের মুখখানা একবার দেখে জীবন পিওন বলে 'আইজ না, আর একদিন।'

৯

জীবন পিওনকে বিদায় দিয়ে কাশেম বাড়ি ফিরে এসে সকলকে ডাকে। এত দিনের স্বপ্ন তার সফল হয়েছে। এবং সে সফলতা এসেছে এমন এক অভাবনীয় পথে যে তা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ ভোলাও যায় না কোন মতে। জীবনের নানা কথায় সে এতক্ষণ মোহাবিষ্ট হয়েছিল—এখন তার সে মোহ কেটেছে। সে গতানুগতিক জীবনে এসেছে ফিরে। দীনহীন ভিক্ষুক—কামনা করেছিল সারেজাহানের বাদশাহী—তা সে পেয়েছে। কিন্তু কেন যেন তার তেমন আনন্দ হচ্ছে না। মনে জাগছে না বিপুল উৎসাহ। জীবন পিওন যেন তাকে বুড়ো করে দিয়ে গেছে। সব কথা সে বুঝতে পারেনি। তবে এটুকু বুঝছে, তার উচিত ঐ চরে তারই মত যারা দিন আনে দিন খায়—ক্ষুধার অন্নের জন্য সংগ্রাম করে জীবনের আটটা প্রহর কাটায়—তাদের নিয়ে বসতি করতে। সে এর মধ্যেই হাফেজকে সংবাদ পাঠিয়েছে, আঞ্জুমানকে সব খুলে বলেছে, আহ্বান করেছে ফরিদকে। বাড়ির উপরের কারুকে সে অগ্রাহ্য করেনি, নিমন্ত্রণ করেছে এ দেশের আরও কয়েক জন ভূমিহীন দুর্ভাগাকে।

কিছু সময় যেতে না যেতেই সবাই এসে উপস্থিত। এক হাফেজের পক্ষে আসা ছিল অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে সে ছিল এপারে—সংবাদ পেয়ে সেও ছুটে এসেছে।

জ্যোৎস্নালোকে হোগলা বিছিয়ে বেশ বড় রকম একটা সভা বসে উঠানে। অনেক সমস্যাই মীমাংসা করতে হবে। নইলে চরকাশেমে যাওয়া যাবে না। গেলেও বোকার মত আবার ফিরে আসতে হবে। নিকটে কোনও ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম বা গঞ্জ নাই। এতগুলো লোক সেখানে গিয়ে করবে কি, তাদের পেশাই বা কি হবে? হাল-হালুটি অসম্ভব। কোথায় গরু, কোথায় বাছুর? কতটুকু জায়গা আবাদী, কতটুকু অনাবাদী তাই বা কে জানে? হয়ত জলের মধ্যেই ডুবে আছে বিশ বাইশ কানি। এর চাইতেও বড় সমস্যা টাকা দুশ কে চালাবে—সব টাকা তো কাশেম চালাতে পারবে না। কিন্তু তবুও কি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে তার নানাভাইর সাধের চর?

চর তো নয় দুধের সর!

আবার স্বপ্ন দেখে কাশেম—সুখের এবং সাধের স্বপ্ন। যে স্বপ্ন সে সার্থক করবে। কিন্তু ফুলমন কি মেছো বাদশার গুলবনে এসে থাকবে?···না, না, সে

বাদশাগিরি চায় না—চায় না গুলবন। চায়—ফুলমন তাকে এগিয়ে দেবে জাল—জুগিয়ে দেবে পাল। সে হাল ধরে চলে যাবে মাঝ দরিয়ায়। ফুলমন হবে মেছো কাশেমের বৌ—বেগম নয়—সাধারণ এক মেছোনী। তবু সে ঘরের বৌ। কিন্তু এতটুকু যে মৌ নেই তার মুখে ?

মুখে না থাক—হয়ত বুকে আছে। সে আস্বাদ কবে কাশেম পাবে ?

'চিন্তা নেই কাশেম—তোর কোনও চিন্তা নেই—ওকি মনমরা হয়ে রয়েছিস যে ?'

'আইসেন দাশ মশয়, বসেন। আপনে থাকতে আমার চিন্তা কি ?'

সভায় সকলেই এসেছে। শুধু আসেনি একজন—সে হচ্ছে ফরিদ। ভীষণ গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ। কোনও কিছুর তোয়াক্কা রাখে না।

ফরিদের অনুপস্থিতিতে সকলেই একটু দুঃখিত। কারণ যোয়ান ছেলেদের মধ্যে সেই বয়সে বড়। বুদ্ধিটাও যে তার প্রখর একথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু এমন মুস্কিল যে সে ইচ্ছা করে না এলে তাকে জোর করে আনা অসম্ভব। তবু আঞ্জুমান গোপনে একবার যায়। 'ভাইজান, তুমি না গেলে মাঝিরপো ভাববে কি ? তোমার মতন একজন বুঝমানের ভরসাও কি সে কম করে ?'

ফরিদের ভাত খাওয়া শেষ হয়েছিল। সে মুখ ভাল করে না ধুয়েই খানিকটা জল খেয়ে দাড়ি গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে আসে। 'কোনও ঘোট পরামশ্ব আমি ভালবাসি না। তয় পেট ভরলে আমি যাইতাম চরে—অত পরামশ্ব লাগত না। যদি আমার ভরসা করে, আইতে কইস একলা এক সময়। যা ভাল বুঝি তা বাতলাইয়া দিমু। ওগো লগে হৈ হৈ কইরা আইজগার রাইতটা খামাকা খুয়ামু ক্যান ?'

আঞ্জুমান নিরাশ হয়ে ফিরে আসে, কিন্তু কারুকে কিছু টের পেতে দেয় না। তার মিঞাভাইর বুদ্ধিটাই যেন কেমন ভিন্নমুখী। অন্য কেউ তো পছন্দই করে না—তবু আঞ্জু কিছুটা করে ? হাজার হলেও বড় তো !

একটা কচি কলাপাতায় জড়িয়ে কল্কিটা টানতে টানতে রসময় জিজ্ঞাসা করে, 'চরে যাবে কে কে ?'

সকলেই যাবে। কারণ এতগুলো লোকের মধ্যে দু-ছটাক, কি দু ধুর ভদ্রাসন ছাড়া জমি নেই। জিরাত কৃষির একটু স্থান নেই। না আছে দুটো মুরগী পোষার জায়গা। কেউ কেউ দুএক পুরুষ ধরে পরের ভিটায় আছে

লজ্জার মাথা খেয়ে ঘাড় গুঁজে। এতগুলো স্ত্রী পুত্র পরিবার জড়িত লোকের নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই, আয় নেই কিছু। তাই তারা অনির্দিষ্টের সন্ধানে যেতে চায় একটুখানি নিষ্কলঙ্ক মাটির আশায়। পেট ভরে খেতে তারা কোন দিনই পাবে না জানে—তবু আশা করে একটুখানি স্বতন্ত্র জীবন যাপনের জন্য, —সামান্য একখানা কুঁড়ে ঘর। তার আশে পাশে ছোট একটু নিজস্ব চৌহদ্দি —যেখানে খেলবে গড়াবে উলংগ ছেলেমেয়ে, বিনা ঝগড়ায় লাগাবে দুটো কলাগাছ কিম্বা বেড়ার কোলে পুঁইলতা।

'যাবে তো সকলে, কিন্তু শ-তিনেক টাকা চালাবে কে? সব কাজ গুছিয়ে আনতে তিনশতেও কুলায় কিনা সন্দেহ। কাশেমের কি আছে না আছে তোমরা তো জানই সব। সে লাভ চায় না কিন্তু আসল খরচটা তো সকলের চালান উচিত।'

রসময়ের কথায় সকলে মাথা নাড়ে। সম্মতিসূচক জবাব আসে। 'তা তো সত্য, দাস মশয় সত্য।'

'তা যদি বুঝে থাক ভাইজানেরা, তবে টাকা নিয়ে চলো—একেবারেই সব কাজ হাসিল করে আসি। লেখাপড়িও তোমাদের সঙ্গে কাশেম ঐ সময়ই করবে।'

'কত লাগবে?'

'এই মাথা পিছু পনর বিশ টাকা।'

এইবার সভা ভাঙতে আরম্ভ করে। রসময় কাশেম সবই বুঝতে পারে। তারা চুপ করে দেখে, এতক্ষণ পর্যন্ত যে উঠানটা সরগরম হয়েছিল এতগুলো লোকের সমাবেশে, তা কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। বাড়ির ওপরের লোকগুলো পর্যন্ত ঘরে গিয়ে বসে। উঠানটা একদম খালি।

'একটু তামাক সাজ কাশেম—বুদ্ধির গোড়ায় ধুঁয়ো দিয়ে নি।'

কাশেম তামাক দেয়। 'এখন ক্যামন হইবে দাস মশয়?'

'কত টাকা আছে? দেখলিত মামুদ মাঝির দৈত্যের মত আট আটটা ছেলেও উঠে গেল। আট দশা আশিটা টাকাও যদি ওরা দিত।'

কাশেম কোন জবাব দেয় না। রসময় একা একাই বলে চলে; 'দেবে কি করে, নিজের ক্ষেমতায়ই তো বুঝি সব। আমারও তো ঐ চরে যাওয়ার ইচ্ছা। ডাকিনী যেমন ভাঙছে—হয়ত আর জোর বছর তিনেক লাগবে আমার পুকুরের পাড় ধ্বসে পড়তে। কাশেম, আমিও তো এখন কিছু দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলে দিচ্ছি, তোর কোন চিন্তা নেই। মনের ইচ্ছা থাকলে টাকার জন্য

কাজ ঠেকে থাকে না। এ আমার অনেকবার পরীক্ষা করা। তোর কোন চিন্তা নেই।'

'কার সঙ্গে কথা কন দাস মশয় ?'

'কেন, কাশেম ?'

'মাঝির পো তো এখানে নাই।' আঞ্জুমান রসময়ের কাছে এগিয়ে এসে বসে।

'গেল কই ?'

'আপনে না জানলে আমি জানুম ক্যামনে ?'

'ছোকরা বড় মুস্কিলে পড়েছে। যখন আমাকে বলে যায় নি, যেখানে যাক এক্ষুনি আসবে।'

তুষের তাওয়ায় ফুঁ দিয়ে দিয়ে আঞ্জু একটা বিড়ি ধরিয়ে রসময়কে দেয়। 'আচ্ছা দাস মশয়, মাঝির পো করবে কি ?'

'একটা কিছু করবেই।'

'আমার কাছে কত সাধ আল্লাদের কথা কইছে, এখন যদি সেই চরই যায় !'

'তা যেতে পারবে না যখন আমি রয়েছি আঞ্জু।'

'আপনার তো আর বহায় সেলামী দেওয়ার সঙ্গস্থা (অবস্থা) নাই।'

'তা তো জানিসই তোরা—আর গাঁয়ের কেইবা না জানে !'

তবু রসময় পারবে। সে মনের জোরে আকাশের নক্ষত্র উপড়ে এনে দেবে যাকে ভালবাসে তার হাতে।

'আঞ্জু, রহিম কোথায় ?'

'কাইত (ঘুমান) হইছে।'

'ছেলে মেয়ে ?'

'সব··· '

'তুই যে এখনও ঘুমোস নি ?'

'মাঝির পোর খানাপিনা হয় নাই।' আঞ্জু হোগলার এক পাশে বসে জিজ্ঞাসা করে, 'চরের বাড়িগুলো হইবে ক্যামন ?'

'কেন, তোরা যাবিনে ? এপার যে ভাঙছে, আর এতো সাত সরিকের ঝগড়ার বাথান।'

'যামুতো, গেলে তো ভাল হয় ঐ আপনারা যে কন পাডার (পাঁঠার) ইচ্ছায় কি ঘাড়ে কোপ ? যাউক ; মিঞার বাড়ি নাই ঘর নাই—সাদি সোমন্দ কইরা সুখে থাউক। দোয়া করি···।'

'কি দোয়া করো আঞ্জু?' বলতে বলতে কাশেম বেরিয়ে আসে। 'এই আমার যা কিছু আছে দাস মশয় গইনা দেখেন—এই পাতিলডার মধ্যে।'

'এই জন্য এতক্ষণ! তা একটু বলে যেতে হয়। আয়, আঞ্জু, ওকে বসতে দে।'

'যদি চুরি করি? কোথায় থুইছিলা পুইতা? যদি আগে কইতা?'

'তুমি যে এখনও জাইগা আছো জানলে কি আমি আর যাইতাম পাছ দুয়ারের আমতলায়?'

আঞ্জু বলে, 'আমতলায় গেছো, ব্যালতলায় যাইও না—বুঝলা—মাঝির পো?' একটা বেলগাছ আছে ফুলমনদের উঠানে।

কাশেম রহস্যটা নীরবে উপভোগ করে।

রসময় টাকা গুণে বলে,—

'টাকা তো হলো মোট একশ পাঁচটা।'

'বড় মেহেনত কইরা জমাইছিলাম দাস মশয়। কত ঝড় জল গেছে পিঠের উপর দিয়া।'

'তার জন্য এখন আর দুঃখ কি?'

'না, না দুঃখের কথা কি—দুঃখের কথা তো না—এই কইলাম খাটুনির কথা। টাকা কি এখনই লইয়া যাইবেন?'

'তোর কাছেও থাকতে পারে।'

'না না আপনেই লইয়া যান—ও ঝামেলায় আমার আর কাম নাই। কিন্তু এখনও যে দুইশো টাকার টান? যামু নাকি পঞ্চাইত বাড়ি?'

'যেতে পারিস যদি নানার চর দেনার দায়ে বিকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে। ওরা এমন একটা চরের নাম শুনলে টাকা অবশ্য দেবে, তবে কবলা নয়তো বন্ধক রেখে। কেমন তাতে তুই রাজী?'

'ও সব আমি বুঝি না। আমার যা আছে তা দিলাম এখন আপনে যা পারেন করেন। অত কথা ভাবলে আমার মাথা ঘুরায়।'

'তুই তো বাপজান সেদিনের ছেলে। আমি না চিনি কোন ঘুঘুকে। ঐ নিবারণ যেমন দাগা দিয়েছে আমাকে তেমনি পঞ্চাইতেরা লুটে পুটে খেয়েছে আলাম ভাইদের। চল সদরে—ঐ টাকা দিয়েই দেখিস কি করে আসি। কুমীরের মুখে গিয়ে কাজ নেই।'

কাশেম কিছু কুল কিনারা পায় না। শুধু ভাবে যাদু মন্ত্র না জানলে এ দায়

থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সেই যাদুই কি জানে ঐ শুকনো মানুষটি ? এক রাত্রেই কি বালির পাহাড় দেবে মন্ত্রের জোরে টাকার পাহাড়ে পরিণত করে ? শুধু টাকা, রূপোর, অজস্র চকচকে টাকা ! ঝন্ ঝন্ করে বেজে গড়িয়ে পড়বে চারিদিকে !

১০

রসময়ের গুণে এমন যোগাযোগ ঘটে যে কোনও কাজই কিছুর জন্য ঠেকে থাকে না।

সদর থেকে সমস্ত কাজ হাসিল করে রসময় ফিরে আসে কদিন বাদেই। কোন গোলমাল হয় না, কোন ঝঞ্ঝাট বাধে না। অথচ টাকাও লাগেনি বেশি। বহায় সেলামী বাবদ মাত্র ত্রিশটাকা খরচ করেছে, বাকিটা ব্যয় ঘুষে। ঘুষ এমনই জিনিস যে তা যখন যার হাতে পড়ে তখনই তার কলম চলে কলের মত। কাশেম কে বা কোথায় বাড়ি তাও কেউ খোঁজ নেয়নি, শুধু গুণে দেখেছে টাকা।

রসময় ব্যবস্থা করে এসেছে যে প্রতি সন মাত্র ত্রিশ টাকা করে দিয়ে যাবে, তাতে যত দিনে শোধ হয় কাশেমের বহায়ের দেনা। দরকার হলে কর্মচারীরা ঐ ত্রিশকেও তেত্রিশ ভাগ করে দিতে পারবে যদি তাদের মজুরিটা বজায় থাকে ন্যায্য মত। বলতে গেলে হাকিম তারাই, শুধু হুকুম দেয় ঐ সাহেবটি !

সদরে বসে শুধু একটু গোল বাধিয়েছিল কাশেম। রসময় তাকে হোটেল থেকে খেয়ে কাছারীতে যেতে বলেছিল—সে নিজে চারটি মুখে দিয়েই এলো বলে। কাশেমও খেয়ে দেয়ে গোবেচারীর মত গেল বটে, কিন্তু একি ! সব দালানই যে একরকম। হাকিমগুলোও প্রায় দেখতে এক। সে ঠিক জায়গামত গিয়েও পিওনের কাছে জিজ্ঞাসা করে বিভ্রাট বাধাল। 'এইডাই কি হুজুরের এজলাস ?'

'কোন হুজুর ?'

'খাস কলের (খাস মহলের) ।'

পিওনটি অমনি গম্ভীরভাবে বলে, 'না ।'

'তয় কোনডা ?'

'ঐ যে ছোট ছোট সুন্দর দালান দেখছ সব—ওর প্রথম কামরা ।'

কাশেম নতুন মানুষ। দেরি হলো নাকি ভেবে সে তাড়াতাড়ি ছুটে যায়।

কানে পৈতা জড়ান একজন ক্ষেত্রী পুলিশ লোটা হাতে বেড়িয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কাঁহা যাতা—এই উল্লুক!'

'খাস কলের হাকিমের এজলাসে।'

'ভাগ শালা—হিয়া নেই।'

কাশেম ভাবে কথাটা ঠিক, নইলে হাকিমের গায় কি এত দুর্গন্ধ!

এমন সময় রসময়ের সঙ্গে দেখা। সে সব শুনে কাশেমকে আর একা একা যেতে দেয়নি কোনখানে।

চরের নাম মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় 'চরকাশেম' হয়ে। সদর থেকে নৌকা করে ফেরার পথে মাঝ রাত্রে রসময় ও কাশেম খানিক সময়ের জন্য চরে নামে। 'কাশেম এই তোর নানাভাইর জমি—হয়ত গোরস্তানও আছে এখানে। তুই তো দেখতে পাচ্ছিসনে—তারা হয়ত রোজ কেয়ামতের দিনের অপেক্ষা করছে। তুই তাদের সেলাম কর।'

কাশেম ভক্তিভরে সেলাম জানায়—তার নানা নানী এবং চেনা অচেনা বিগত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে। সে চরের মাটিতে হাত বুলিয়ে দেখে। দুটো কাশ ফুলের দীর্ঘ মোলায়েম গুচ্ছ নাড়ে। শান্ত নিথর চারিদিক। সে ভাবে এ তার স্বপ্নের দেশ। সুখের স্বপ্নের—সাধের স্বপ্নের—রূপকথার দেশ। কাশেম বিহ্বল হয়ে পড়ে। চরের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে একটা সোঁতো খাল চলে গেছে। তারপর একটা বেশ বড় আম বাগান।

রসময় বলে, 'বোকার মত এতদিন এখানে ওখানে টওয়া না ফেলে যদি এই বাগানটায় এসেও একখানা ঘর তুলতিস, তবে অনেক শ্রীবৃদ্ধি হতো চরের। ঐ বাগানটা ভাঙেনি, বোধ হয় ঝুলে ছিল ডাকিনীর খাড়া পাড়ে।'

'আমি কি কইরা জানুম দাস মশয়—মানুষে ঠাট্টা কইরা আমারে দেখাইয়া দেছে অথৈ পানি—থাঁও পাই নাই কি সাধে!'

'মানুষের দোষ কি—এ তার স্বভাব। আমিও তো তোকে ঠাট্টা করেছি কত।'

'কিন্তু সব ঠাট্টাই তো আইজ ঢাইকা দিলেন নিজের গুণে।'

'চল কাশেম, আর দেরি করলে উজান পড়বে।' রসময় সঠিক জবাবটা কেন জানি এড়িয়ে যায়।—'চল বাপজান 'পারা' তোল।'

'আর এট্টু কাল—এক ছিলিম তামাক খাইয়া লই।' কাশেম তামাক সাজে কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে কল্কিটা হাতে দেয় রসময়ের।

রসময় সস্নেহে হাসে।

চরের পলিমাটিতে হাত দিয়ে কাশেম ভাবে :

চরতো নয় দুধের সর !

বাড়ি এসে উঠতেই হঠাৎ কাশেমের উপাধিটা বদলে যায়। আর বদলানও ঠিক বলা চলে না—তার তো কোন সঠিক উপাধিই ছিল না।

রহিম অভ্যর্থনা করে, 'আসেন হাওলাদার সাহেব—আসেন।'

কাশেম ভাবে তাকে বুঝি ঠাট্টা করছে রহিম। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যায়—দেশের অনেক ছোট বড় লোক এসে রহিমের দাওয়ায় বসে তামাকের শ্রাদ্ধ করছে। আঞ্জুমান তো পান সুপারি যোগাতে যোগাতে অস্থির হয়ে পড়েছে। বছরের সুপারিটা তার ঘরে মজুত ছিল কিন্তু এই ব্যাপারে তা প্রায় সাবাড়। তার জন্য আঞ্জুর দুঃখ নেই। সে আজ আর কাশেমকে হাত পা ধুতে ঘাটে যেতে দেয় না। জল এনে দেয় 'পাছ দুয়ারে' একটা বড় বদনায়। সে আনন্দে শুধু এইটুকুই বলে, 'ঘাটে গেলে আইজ গোসা হমু—পানি রইছে ঐ পৈঠার পাশে। একন একটু তাছিল (সম্মান) মত চলেন হাওলাদার।'

'আমি আবার হাওলাদার হইলাম কবে ?'

'সরকার বাহাদুর সোনমান করছে, নানার হাওলা নিরানব্বই কানি ফিরাইয়া দেছে—এখনও কন এই কথা ? কতলোক আইছে দেখি আপনারে দেখতে। উলানিয়া থিকা আপনার ফুফা আর তার দুই ছাওয়াল আইছে, আইছে হলইদখালির গাজী। সে নাকি আপনার সাক্ষাৎ মামু ? আপনে গেছেন ইস্তিক দেখি ওনাগো ভাত রান্ধি। এখন একটু তাছিল মত চলেন—হর হামেসা ঘাটে যান না জানি হাত পা ধুইতে।'

কাশেম ভাবে কি হবে কি জানি। সে বাস্তবিকই 'পাছ দুয়ারে' একটা জল চৌকিতে বসেই হাত পা ধোয়। বোধ হয় গোপনে ব্যবস্থা করা ছিল—অমনি দেশী নাপিত এসে কাশেমকে জোর করে ধরেই তার চুল দাড়ি ও গোঁফে

যথাক্রমে কাঁচি ও ক্ষুর চালাতে আরম্ভ করে। কাশেম অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বাধ্য হয়ে আত্মসর্পণ করে।

'উঃ বড় লাগে! তোমার হাতিয়ারে ধার নাই নাপিতের পো। একেবারে বেড়ার সাথে আমারে ঠাশইয়া লইছ।'

'ছিঃ হাওলাদার, ওকথা কয় না—এট্টু পয়-পরিষ্কার হইতে অভ্যাস করেন।'

ক্ষুর ও কাঁচি যেমনই হোক না কেন কাশেমকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়।

বাইরের কেউ না শোনে এই ভাবে নাপিতের পো বলে, 'এই হইল আর কি! বাদশাহী ঢকে দশ আনি ছয় আনি ছাট দিতে আছি।'

কাশেমের দেরি দেখে বাইরের জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। অন্দর মহলে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এসে কেবলই খোঁজ নিতে থাকে। উৎসুক জনতাকে ব্যস্ত রাখার জন্য রহিম কেবলই তামাক ও পান পরিবেশন করে আর বলে, 'এই ত আইল আর কি!'

অবশেষে কাশেম এসে উপস্থিত হয় রঙ্গমঞ্চে।

সকলে একটু বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখে। না,—যতটা ভাগ্য বদলেছে ততটা তো চেহারা বদলায় নি। তারা অসম্ভব কিছু আশা করেছিল। তবে মুখে চোখে একটু শ্রী পড়েছে—লক্ষণ দেখা যাচ্ছে আমীরীর।

কাশেম সকলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে, 'বোলাইছেন ক্যান?'

গ্রামের কেউ কিছু জবাব দেয় না। তারা কি-ই বা বলবে?

কাশেমের মামু ও ফুফার দল এগিয়ে আসে এবং এতদিন যে এসে তার সংগে দেখা করতে পারেনি তার কারণ দেখায় অনেক। ছেলে সমেত ফুফা কাঁদে, গাজী দোয়া করে।

পরদিন বিদায় নেওয়ার সময় ফুফা কাশেমের হাতে সঁপে দিয়ে যায় দামড়ার মত তার ছেলে দুটোকে।

সত্য সত্য গরু হলে হালে জোড়া যেত কিন্তু এদের দিয়ে কাশেম করবে কি? নিজেই খায় থাকে পরের ওপর। এমন জমানো ধান চালও তো নেই তার গোলায়। তবু সে কিছু বলতে পারে না। এই ফুফার স্ত্রীই তাকে ধার দিয়েছিল আড়াই টাকা।

তখনকার সেই লাঞ্ছিত শৈশবের কথা আজও ভোলেনি কাশেম—হয়ত এ জীবনে ভুলতেই পারবে না। সেই মায়ের মত ফুফু, তারই ছেলে এরা—এরা

যদি দাবি করে থাকে, খায় ঘাড়ে চড়ে, তবে এদের ঠেলে দেবে কোন অজুহাতে ? এদেরও কিছু জমি দেবে, বসিয়ে দেবে চরের এক পাশে।

অনেক অভ্যর্থনা অভিনন্দন আসে গ্রামের বাছা বাছা বাড়ি থেকে কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায় না পঞ্চাইত বাড়ির। কাশেমও আর সেদিকে পা বাড়ায় না। তার সময় কই ? সে এখন মগ্ন তার চরের চিন্তায়। আবার হাতেও নেই পয়সা, মাঝে মাঝে আসছে অতিথি অভ্যাগত। তবু ঘরে কিছু চাল ছিল, নইলে কান দুটোই কাটা যেত।

কিন্তু তবু এক এক সময় তাকে উন্মনা করে দেয় ফুলমন। সে আসে তার মানস লোকের পদ্মবনে রাজহংসীর মত উদ্ধত বক্র গ্রীবায়। চঞ্চল পক্ষ বিধুননে তাকে অস্থির করে তোলে কিন্তু কথা বলে না। ওকে দেখলে যেন দূরে সরে যায়, ও সাহস পায় না ওকে ধরতে। কাশেম ভাবে একদিন ঐ রাজহংসী ধরা পড়বে এই ব্যাধের হাতে যখন চরকাশেমের পাশে ফেলবে বেড়া-জাল—আর ও আসবে ভুল করে এই নদীতে জলকেলি করতে।

কাশেম কোথাও যায় না কিন্তু ফুলমনও কি আসে ?

রহিমকে হঠাৎ একদিন দেখতে পেয়ে পর্দা সরিয়ে পদ্মফুলের মত মুখখানা বের করে ইসারা করে ডাকে।

রহিম আসে। তারপর যায় বাগানের দিকে। একটা ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছের আড়ালে গিয়ে থামে।

রহিম জিজ্ঞাসা করে, 'কি, ডাকছ ক্যান ? তোমার চাচার গাছের ঝুন কয়ডা পারাবা নাকি ?'

'ক'ও বেশ—তয় ডাকছি ক্যান !'

রহিম কাঠবিড়ালের মত গাছে ওঠে। গোটা পাঁচেক নারকেল—একটা দাঁতে এবং বাকি চারটা দুহাতে করে অতি সন্তর্পণে নেমে আসে। এসব চোরাই মাল আধাআধি বখরা হবার কথা। কিন্তু ফুলমন সহজ মেয়ে নয়—সে রাখে তিনটা। রহিম ভাবে : তবু তো দুনো মজুরি।

'তোগো হাওলাদার আছে কেমন ? হাল গরু জোড়ছে নাকি যে দেখি না মোটে ?'

'অত ঠাট্টা কইর না—খোদায় যখন জমি দেছে তখন হাল গরু জোড়তে কতক্ষণ !'

'সে গরুর ঠ্যাং নাই, আর সে লাঙলের ইষ নাই !'

রহিম ক্রুদ্ধ না হয়ে পারে না। তারা যাকে সম্মান করে তাকে এত দূর অবহেলা।—'না থাউক ঠ্যাং, না থাউক ইষ কিন্তু হাওলাদারে ইচ্ছা করলে এখন তোমাগোও বিষ মারতে পারে। আইজ কাইল তারে এদেশে খাতির না কইরা পারে কেডা ?"

ফুলমনও কি মুখরা কম ! সে জবাব দেয়, 'কার বিষ কে মারে কেডা তা জানে ? কইতেই কয়—দুধের পরি (পাহারা) হোলাবিলই (বিড়াল) মারবে তোরে জানে।' ফুলমন আর দাঁড়ায় না।

কথাটা আঞ্জুমানের মারফতেই কাশেমের কানে যায়। কাশেম বলে, 'আর কমু কি আঞ্জুমান—আমার আর কওয়ার কিছু নাই।'

তারপর একা একা বসে সে ভাবে : ফুলমন তো না—দুষমন ! আশৈশব ওকে ও জ্বালিয়েছে। বড় হলে গোলাম নফর বান্দা বলে ক্ষেপিয়েছে—খুঁচিয়েছে পোষা বাঁদরের মত। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত না করে কখনও কথা বলেনি। আজ তো অহঙ্কারীর আওতা ছাড়িয়ে কাশেম দূরে চলে এসেছে। হয়ত সামান্য সৌভাগ্যের সূর্য উঁকি দিয়েছে খোদার ফজলে। কিন্তু ও তবু তার কাছে কি চায় ? দূরে বসে কেন ছুঁড়ে মারছে এ কলঙ্কের কালি ? ফুলমন তো না, কাশেমের ভাগ্যাকাশে দুষমন !

১১

রসময় কাশেমের সংগে পরামর্শ করে সব ঠিক করে ফেলে। কে কে চরে যাবে, কি কি সংগে নেবে, কেমন সব ছোট ছোট চৌহদ্দিতে ভাগ হবে জমি। কিন্তু সব পরামর্শই তাদের উল্টে যাওয়ার জোগাড়। নদীতে নেমেছে উত্তুরের ঢলক। কোথায় যেন ভীষণ বন্যা হয়েছে। যদি এই জল একটু টান ধরার আগেই আবার বর্ষা আসে তবে এ সময় আর যাওয়া যাবে না চরে। নদীতে বড় বড় নৌকাই চলে কত সাবধানে—ছোট ছোট নায়ে এরা পাড়ি দেবে কি করে ?

ঢলক এসেছে—সফেন ঢলক। ঘোলা জল দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলছে দু'কূলে সর্বনাশা আতঙ্ক ছড়িয়ে। এ ক্ষুরধার দুর্বার গতির দিকে চাইলে মাথা

ঘুরে যায়। স্রোতের গতির সংগে সংগেই চলেছে আবর্ত। ঘূর্ণি হাওয়ার মত পাক খেয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সফেন জলরাশি। তার সংগে যেন রয়েছে চুম্বকের আকর্ষণী মন্ত্র। দুদিকের গাছ পালা খড়-কুটো যা আসছে ঐ ঘোলার মুখে, তাই টেনে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাতালের দিকে। স্থানে স্থানে এ ঘোলা এমন মারাত্মক যে বড় বড় জাহাজও ভয় পায় পাড়ি জমাতে। নৌকা এলে তলিয়ে যায় চোখের পলকে। ঢলকে ঢলকে জল—শুধু জল! কোথাও দেখা যায় না মানুষ জন পাল-মাস্তুল।

যে বর্ষার আশঙ্কা করেছিল রসময় ও কাশেম সেই বর্ষাই নেমে আসে আকাশ ভেঙে। রোদের আর চিহ্ন দেখা যায় না দুতিন সপ্তাহ। শুধু পূবা হাওয়া আর জলো মেঘ। বৃষ্টি থামছে না মোটেই। ছোট ছেলেমেয়েগুলো উঠানে পা দিতে পারে না—জড়াজড়ি মারামারি করে দাওয়ায় বসে। ব্যাঙের ডাক, কাদার জ্বালা—সবাই যেন ঝালাপালা হয়ে উঠেছে এই কটা দিনে।

আবার কে যেন একটা সংবাদ জানায়—

ডাকিনীর ঐ যে গোঙানি শোনা যায় ও কিন্তু ভাল নয়।

আঞ্জু জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যান হাওলাদার? বর্ষাকালে তো প্রতি বছর গাঙের ডাক শোনা যায়।'

'এবার গুমগুম করে মাটির তলে। থাড়া পাড় নামবে তলখাড়ি হইয়া। কয় কানি লইয়া যে ধস লামে কওয়া যায় না। কাইল অনেক রাত্তিরে আমি চমকিয়া উঠছি গুমগুমানি শব্দে।'

'আমাগো দশাডা হইবে কি?'

'ভয় বেশি দাস মশয়র। তানাগোর বাড়ি ছৈলাতলীর পাশে।'

'বড় বড় জয়াল (মাটির চাকা) লামতে থাকলে আমাগোও কি ভরসা আছে?'

দেখতে দেখতে নদী আরও ভয়াল হয়ে ওঠে। বিঘার পর বিঘা পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়তে থাকে জমি ক্ষেত বাগ বাগিচা সমেত। বড় বড় নারকেল সুপারি গাছ থৈ পায় না কূলের কাছে। জলের ঝাপটা তুফান যেন আক্রোশে আছড়ে পড়ে পাড়ে। নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে চাইলে বুক শুকিয়ে যায়। চিরপরিচিতার একি প্রলয়ংকরী মূর্তি? স্নেহ নেই, মায়া নেই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষুধা। লাবণ্য নেই, কেবলই উলংগ নৃশংস বর্বরতা।

গাঙ গোঙাচ্ছে—ভাঙছে নিষ্করুণভাবে। ক্ষুধার্তা নাগিনী গিলে খাচ্ছে সব কিছু। মানুষ পালাচ্ছে বাড়ি ঘর ছেড়ে।

যারা এ বছর অনুমান করেছিল যে অন্যত্র যাওয়া দরকার হবে না, তারাও এই ঝড়-জল মাথায় করে সরতে লাগল সুবিধা মত স্থানে। কেউ গেল আত্মীয়-বাড়ি, কেউ উঠল প্রতিবেশীর দাওয়ায়—কেউ বা নৌকা কেরায়া করে ভেসে রইল খালের মধ্যে। একটু জল-বৃষ্টি থামলে যেদিকে হোক যাবে। পুত্র পরিবার গরু বাছুর নিয়ে কি যে অপরিসীম লাঞ্ছনা তা আর বলা চলে না। দু-চারটা গরু ছাগল খাদ্যাভাবে মরল। হাঁস পায়রা চলে গেল এদিকে সেদিকে।

রসময় ভিজতে ভিজতে এসে বলে, 'একটি বার তুই যদি না যাস তবে কিছু যে আনতে পারি রাক্ষুসীর মুখ থেকে—তা মনে হয় না। এমন ধারাও এবার ভাঙন ধরলো !'

সন্ধ্যামণিও সঙ্গে এসেছিল। তাকে বসতে দিয়ে একটা গামছা নিয়ে কাশেম যায় রসময়ের সংগে। 'আর একটু আগে খবর দিলেই পারতেন।'

'কাল সারারাত তো চণ্ডীমণ্ডপে ছিলাম স্বামী-স্ত্রীতে। ওকে একলা ফেলে আসি কি করে ? যদি বড় ঘরের দু-বান টিনও না খুলে আনতে পারি তা হলে বল তো উপায় হবে কি ? এ জীবনে কি আর জুড়তে পারব ?'

উপায় যে কি হবে তা কাশেম কেন কেউই বলতে পারে না। তবে সে এই পর্যন্ত পারে—নিজের জীবন বিপন্ন করেও এই মহানুভব লোকটির কিছু টিন-কাঠ রক্ষা করতে। রসময় যা ব্যক্ত করেছে তাতে বোঝা যায় যে ডাকিনী ওর বড় ঘরখানা প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে।

জল-কাদার জন্য সোজা পথে আসা যায় না। সোজা পথটা ছিল নিকুঞ্জ মাইতির বাগানের ভিতর দিয়ে—সে পথের বিশেষ কোনও অস্তিত্ব নেই। শুধু গর্জন শোনা যাচ্ছে নদীর।

কাশেম ও রসময়ের পিছনে পিছনে কিসের যেন শব্দ শোনা যায়। পদ-শব্দ। রসময়ের গৃহপালিত কুকুরটা জল-কাদা ঝাঁপিয়ে সংগে সংগে আসছে। ওটা একবার অতি কষ্ট করে রসময়ের সংগে কাশেমদের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল, আবার প্রভুর পেছনে পেছনে যাচ্ছে। এ বিপদের সময় প্রভুকে যেন কাছ-ছাড়া করতে চাচ্ছে না।

কাশেম এগিয়ে যেতে চায়। রসময় তার হাতখানা চেপে ধরে। ভোলা ওঠে ঘেউ ঘেউ করে। রসময়ের সারা বাড়ি জুড়ে একটা চিড় খেয়েছে মাটিতে।

যদি রসময় হাত না ধরত, কাশেমকে টেনে না ফিরাত তবে যে আজ কি হতো বলা যায় না।

'ছাড়েন দাস মশয়, পারুম ঐ আলগা টিন ক'খান খুইলা আনতে, সব যে যাইবে!'

'আমার টিনে কাজ নেই কাশেম। দেখছিস কেমন ফাটলের হাঁ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। ঐ দেখ, ঐ দেখ—'

কাশেম চেয়ে দেখে সব। তবু কেমন করে যেন রসময়ের হাত ফসকে এগিয়ে যায় ঘরের কাছে। সে শুনতে পায় তার পায়ের তলায় একটা ভয়ংকর গোঙানি—গতকাল রাত্রে যে গোঙানি শুনে সে চমকে উঠেছিল ঘুমের ভিতর। তবু সে ঘরের টুয়ায় (ছাতে) উঠে টিন ধরে টান দেয়। ভাবে পারবে বুঝি টিন নিয়ে ফিরতে।

'ফের কাশেম—ফের। বাপজান কাজ নেই আমার টিনে।'

পায়ের তলাটা কেঁপে ওঠে। একটা আর্তনাদ শোনা যায়। নারিকেল ও সুপারি বাগানে। কাশেম আর ফিরতে পারে না। সে যেন চারিদিকের পৃথিবী সমেত ধ্বসে চলেছে পাতালে।

রসময় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কেঁদে ওঠে ভোলা। একটা ঝাপটা বাতাসে ফাটলের এ পাশের উন্মুক্ত সুপারি গাছগুলো রসময়ের ধ্বসে যাওয়া ঘরবাড়ির ওপর কে যেন বেঁকিয়ে ফেলে ধনুকের মত।

রসময় ডাকে 'কাশেম! কাশেম!'

তার মর্মভেদী ডাক ডুবে যায় পদ্মায়—কেউ জবাব দেয় না। সে চেয়ে দেখে কীর্তিনাশা গ্রাস করছে তার কাশেমকে আর তার চৌদ্দ পুরুষের ভদ্রাসনখানা। ঘোলা জলে এমন একটা প্রলয়ের আন্দোলন সৃষ্টি হল, যা ব্যক্ত করা কঠিন, অসম্ভব।

কিন্তু বড় বাঁচা বেঁচেছে কাশেম। সে একটা ধনুকের মত বেঁকান সুপারি গাছের মাথা আশ্রয় করে বাড়ির এপাশে এসে ছিঁটকে পড়েছে—যেমন করে ওরা পড়ে সুপারি পাড়ার সময়। 'দাস মশাই সরিয়া আসেন। আবার ভাঙবে ডাকিনী।'

রসময় চমকে ওঠে। কাশেম এসে তার হাত ধরে টান দেয়। সে জড়িয়ে ধরে কাশেমকে।

ইতিমধ্যে রসময় হাত বাড়িয়ে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে তার হর-গৌরীর মূর্তিখানা উদ্ধার করেছিল—এখন তাই বুকে করে কাশেমের সংগে ফিরে আসে।

আগে চলেছে কাশেম, পেছনে ভোলা—মাঝখানে সর্বহারা রসময়।

তবু সে বলে, 'চিন্তা করি না কাশেম—আমার হর-গৌরী তোকে তো বাঁচিয়েছেন!'

রসময়ের সংগে সংগেই কাশেম কিন্তু বাড়ি ফেরে না। সে যায় গাঁয়ের ভিতর বড় খালের পাড়ে। একখানা বড় ঘাসি নৌকা আছে তালুকদার বাড়ি। সেখানা কেরায়া করে আনতে হবে। নইলে যদি প্রয়োজন হয় রাত-বিরেতে তখন পাবে কোথায় নৌকা? এবার গাঙের গতি ভাল না। একেবারে বাঁকটা সমানও হয়ে যেতে পারে। তখন আঞ্জুদের নিয়ে সে যাবে কোথায়? তা ছাড়া আপাতত দাস মশাই ও তার স্ত্রীই বা থাকবেন কোথায়? ঐ তো দাওয়া, আর ঐ তো ওদের ঘর! একটা ভাল ব্যবস্থা না হলে, হয় মা ঠাকরুণ নিজে না খেয়ে মরবেন—নয় তো দাস মশাইকে মারবেন কথার ছলে। আর সত্যি বলতে কি, যারা অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তারা কি করে চোখের ওপর দেখবেন ফরিদ মিঞার সাত শরিকের বাড়ির নোংরামি। আঞ্জু বাড়ির একলা মালিক হলে কিছুটা সমঝে চলতে পারত।

বেশ বড় একখানা নৌকা আসে। রান্নাবান্না দেবসেবার জন্য পেছনের খোপে রসময় 'শ্রীদুর্গা' বলে আরোহণ করে। কিন্তু রসময়ের সেখানেও শান্তি নাই। সন্ধ্যামণির নিত্য নতুন প্যানপ্যানানি বাড়তে থাকে। ক্রমে সে কাঁদতে শুরু করে ইনিয়ে-বিনিয়ে?

রসময় বলে, 'যখন আমার হর-গৌরী কাশেমকে বাঁচিয়েছেন তখন আমার সব আছে। কাশেম তো আমাদের ছেলে?'

'তোমার মত অত সহজে আমি গলি নে।'

'না গলো না গলো, চুপ করে থাকো। কখন আবার বেচারী শুনে ফেলবে।'

'শুনুক।'

'এই যে সব আমাদের জন্য করছে তা বুঝি কিছু নয়—রাতারাতি একখানা দালান তুলে দেবে নাকি? বলি, আমাদের জন্য তার এমন দায় ঠেকাটা কি?'

ইতিমধ্যে কাশেম আসে। 'নায়ে ওঠতে পারি দাস মশয়? রান্না চড়াইছেন নাকি মা-ঠাইন?'

'তাতে কি তাতে কি, বৃহৎ কাষ্ঠে কোন দোষ নেই। উঠে গলুইতে বসো, তামাক খাও।'

কাশেম ওঠে—ভোলা তীরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে।

যতদিন বাড়ি-ঘর ছিল তখন ভোলারও কদর ছিল সন্ধ্যামণির কাছে।

১২

একদিন নদীর ভাঙন থামে। ওদের কটা মাস দেরি হয়ে যায় চরে যেতে।

যে ফরিদ কোথাও যাবে না বলেছিল সেই তোড়জোড় করতে থাকে সর্বপ্রথম। সে ঘরদোরের বেড়া ভেঙে প্রথম উনোনে দেয়, তারপর ধরে চালের আলগা আলগোছা সব পুরান বাতা। বর্ষাকালে সে আর তার বৌকে আগানে-বাগানে জ্বালানী কাঠের অনুসন্ধানে ঘুরতে দেয় না। তবে কাঠের তেমন প্রয়োজন কই? প্রত্যহ যা সিদ্ধ করবে দুবেলা তাই নিয়ম মত জুটছে না। সকল ঘরের অবস্থাই প্রায় সমান। একটু ভাল চলছে শুধু আঞ্জুর। নিজের হাতে না থাকলেও হাওলাদার জুটিয়ে আনছে।

'আর বে-আইনী চুরিতে লাভ নাই।'

'এতদিন পর হাজার গণ্ডা ঘা খাইয়া বুঝি বুছলা মিঞা ভাই? এখন সোজা পথ ধরবা বুঝি, তাই জিনিসপত্তর হাড়িপাতিল গুছাইতে লাগছ সক্কলের আগে? কিন্তু যে অলক্ষুইনা কাণ্ড করো তোমরা দুইজনে! ঘরের বেড়া কেও কোনদিন পোড়ায় শত অভাবে?'

'ফেলাইয়া গেলে নিয়া তো যাবে পঞ্চাইত বাড়ি—দেবে নিয়া গোয়ালে।'

'ক্যান্, চরকাশেমে তোমার ঘর বাড়িতে হাওলা বেড়া লাগবে না?'

'আমি তো চরকাশেমে যামু না।'

'ওমা কও কি? তয় যাবা কই?'

'যামু আসাম, আমার সোম্বন্ধীগো সাথে।'

'বৌ-মাইয়া?'

'থাকবে তাগো বাড়ি।'

'ক্যান্, চরকাশেমে গেলে কি তোমারে কেও ঠেইলা ফেলাইত?'

'সেখানে গিয়া খামু কি? দিন রাত্তির খাটুনি—হালাল (বৈধ) পয়সা—ওতে আইজ্ কাইল কারো গলা ভেজে না। দুনিয়াডা হইছে চোরা-চুরির রাজ্য।'

আঞ্জু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি তয় যাবা না চরকাশেম ?'

'না।'

আঞ্জু শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে উঠে যায় ফরিদের কাছ থেকে।

ঘরে গিয়ে আঞ্জু হিসাব করে দেখে তাদের এ বেলার চালও টান টান। তবু ঐ চাল থেকে খানিকটা জলে ভেজায়। সন্ধ্যার পূর্বে ফরিদের বৌকে ডাকে। 'ভাবীছাহেব কয়েকটা পাড় দিয়া যান।'

চালের গুঁড়িতে গরম জল ঢেলে সন্ধ্যার পরই আঞ্জু সুন্দর 'কাঁই' প্রস্তুত করে। তা ছেনে দলা দলা করে তৈরি করে চমৎকার পাতলা রুটিপিঠা। তার কাছে কোথায় লাগে আটার রুটি। একটা ছোট্ট মুরগী জবাই দেওয়ায় এক ভাতিজাকে ডেকে। ওর নিজের ছেলেমেয়ে দুটো হালুম-হুলুম করতে থাকে। কিন্তু এমন গোনা জিনিস যে ওদের তেমন তুষ্ট করতে পারে না। তাই ঘুম পাড়িয়ে রাখে তাড়াতাড়ি।

অন্ধকারে গা ঢেকে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে আঁচল দিয়ে আড়াল করে ঐটুকু নিয়ে চলে আঞ্জু। 'কত ঝগড়া-তক্ক করছি ভাবীছাহেব, মনে রাইখো না।' ঐ পর্যন্ত বলে একটা মেটে বাসন নামিয়ে রাখে।

ফরিদ বলে, 'বয় আঞ্জু।'

অন্ধকারের দিকে চেয়ে আঞ্জু, বলে, 'না—ওনারা বইয়া আছে, খাইতে দিমু।'

ঘরে ফিরে কাশেম ও রহিমকে ডেকে যে কটা ভাত ছিল তা বের করে দেয়। এমনিতেই তো চাল ছিল কম, তার থেকে হয়েছে রুটিপিঠা। শূন্য হাঁড়িটা একধারে পড়ে থাকে।

খাওয়া শেষ হলে রহিম জিজ্ঞাসা করে, 'পিঠা ? সারাদিন যে গুঁড়ি কোটলা ? গোস্তা ?'

আঞ্জু একটু ইতস্তত করে জবাব দেয়, 'বিড়ালে খাইছে।'

'সব ?'

'হয়'। রাতটা আঞ্জুর উপবাসে কাটে।

বাড়ি ছেড়ে আগে চলে যায় ফরিদ তার ছেঁড়া কাঁথা ও পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। তারপর বড় বড় কলা গাছের ভেলা ভাসায় চরকাশেমের যাত্রীরা। তারা এত নৌকা পাবে কোথায় ? ভেলা বোঝাই হয় নানা রকম গৃহস্থালী সাজ-সরঞ্জামে। কেউ কেউ ঘরের চাল পাটমত নামিয়ে সাজায়। হাঁস মুরগীও সঙ্গে সঙ্গে তোলে ভেলায়। হাঁড়ি, পাতিল কোদাল, খন্তা কিছুই বাদ যায় না।

এখন নদীর তোড় পড়েছে। মাঝ রাতে এসে হাফেজ বলে, 'আইজ আবার ফুলমনেরে দেখতে আইছে।'

কাশেম জিজ্ঞাসা করে, 'কোনখান থিইকা—বিলাতথোনে (থেকে)?

'না কাশেম ঠাট্টা না—জামাই দেখতে নাকি সাহেবের মত খুব খাপসুরাত। এবার ফুলমনের সোম্মন্দ ফেরলে কমু ওর বরাত মন্দ। গতবারেরডা আছিলো একেবারে বান্দরের লাখান (মত)।'

কাশেম তার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে চেষ্টা করে গাঙের আরশিতে।

সপ্তাহ একটা শেষ না হতেই চরের বুক জুড়ে ঘর ওঠে। ছোট ছোট নাড়া ও ছনের ঘর। দু চারখানা টিনের ছাপরা। জমি ভাগ হয়ে নানান চৌহদ্দিতে আসে হিন্দু, আসে মুসলমান। দু ঘর নমশূদ্রও আসে—আর দেখা যায় কানাই পরামাণিককে। সে সকলের নাপিত।

এতদিনে অন্ধকার নির্জন চরটা যেন হেসে ওঠে মনুষ্য-সমাগমে। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে, ঠিকরে পড়ে সে আলো চরোখালের জলে। রাত থাকতে মুরগী ডাকে, দুপুর বেলা পায়রা ওড়ে, সন্ধ্যাবেলা হাঁসের ঝাঁক ফিরে আসে চরের কোল বেয়ে বেয়ে। আঞ্জু মুগ্ধ হয়ে দেখে। এর মধ্যে সে একটা খোপ করেছে মাটি দিয়ে—ঠিক একটা সিন্দুকের মত। ওপার থাকতে এগুলো দিনরাত বাঁধা থাকত। ঝগড়ার ভয়ে উঠানেও একটু ছাড়া যেত না—না দেওয়া যেত কারুর পুকুরে নামিয়ে। এখন আর সে ভাবনা নেই। পুকুরের বদলে ওরা পেয়েছে নদী—স্বাধীন আহার, স্বাধীন বিহার। ওদের দেহ জিলজিল করছে—রং ফিরেছে পাখনা পালকের, শরীর হয়েছে ভারী, এখন ডিম পাড়বে হাঁসীগুলো, মুরগী কটাও হাঁসগুলোর সঙ্গে 'উমে' বসবে—ছানা ফোটাবে। তাই তো অত আলাপ দলের সর্দার মোরগটার সঙ্গে।

আঞ্জু মনে মনে ভাগ করে কটা কাশেমকে দেবে, কটা সে নিজে রাখবে। কিন্তু কে পালবে কাশেমের হাঁস মুরগী? আঞ্জুই পালবে। কতদিন?…একদিন কাশেম বিয়ে করে ফিরে আসবে একটি বৌ নিয়ে। সে এসে গুনে হিসাব করে নিয়ে যাবে তার ভাগের হাঁস, পায়রা, মুরগী, ছাগল, সব কিছু। আঞ্জু তাকে সব বুঝিয়ে দেবে, ঠকিয়ে সে কিছুই রাখবে না। হঠাৎ উদাস হয়ে যায় আঞ্জুর মন। একটা চাপা ব্যথা বুকটায় খচ্ খচ্ করে।

চরের বুকে ঘর উঠেছে সকলের; কিন্তু কাশেমের ঘর নেই।

'ও কি ?' একদিন কাশেম প্রশ্ন করে, 'ও কি মিঞা ?'

হাফেজ বলে, 'ঘর উঠামু তোমার লাইগা।' সে কতকগুলো খুঁটি সংগ্রহ করে এনেছে।

'ক্যান্ ?'

রসময় জবাব দেয়, 'ক্যান আবার কি ? তোর ঘর দোর লাগবে না—এত বড় হয়েছিস, বিয়ে-সাদী করবি নে ?' রসময় একটা লতা দিয়ে সুত করে দেয় একখানা নয়-ছয়-পনর বন্ধ ঘরের। 'এ বছরই তোর বিয়ে দেব—নইলে তোর পাগলামি ঘুচবে না। কেবল এপার ওপার !'

তবে এরাও টের পেয়েছে। একটা লজ্জা পায় কাশেম।

রহিম ও হাফেজ দু দিনের মধ্যেই আগাছার খুঁটি দিয়ে বেশ শক্ত করে একখানা নিচু জুতের (রকমের) ঘর তোলে। আঞ্জু এসে লেপে-পুঁছে দিয়ে যায়।

চেয়ে চেয়ে দেখে কাশেম। কেমন তকতকে ঝকঝকে ঘর। বাঁশ বাবলা ছনের ঘর হলেও নিজের ঘর, সুখের ও শান্তির—গর্ব ও গৌরবের। সুমুখে সুদীর্ঘ বালুচর রৌদ্রে ঝলমল করছে, তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা। প্রমত্তা পদ্মা নয়—শান্ত মায়াবী পদ্মা। ওপরে অপার মুক্তাকাশ—নীচে ঝিক-মিক করছে ছোট ছোট ঢেউ। বান্দা কাশেম যেন বাদশাগিরি পেয়েছে। পেয়েছে যেন দিগন্ত-জোড়া জমিন—ঐ অথৈ দরিয়া, যার বুকে কত পাল-তোলা নায়ের বহর। সে আজ যেন চরকাশেমের বাদশা আর ঐ দরিয়ার বুঝি সওদাগর !

কাশেম হাসে।

আঞ্জু ছায়ার মতই যেন থাকতে চায় তার পাশে,—এসে জিজ্ঞাসা করে, 'হাওলাদার হাসেন ক্যান্ ?'

'হাসি এ্যামনে।'

'এ্যামনে হাসে পাগলে।'

'তয় তো আমি পাগল হইছি।'

'কার লাইগা ? কেডা সে রূপসী ?'

'জানি না।'

'আমি কিন্তু জানি, কইতে পারি তার নাম।'

'কও না।'

'ফুলমন।' আঞ্জু হাসে, হেসে আর একটু এগিয়ে আসে—'কি সত্য কি না হাওলাদার?'

আজ কাশেম ক্ষণিকের জন্য হৃদয়ে আর একটা সত্য অনুভব করে—নিজেকে প্রশ্ন করে—শুধু কি ফুলমন? ভাবে আঞ্জু তার কাছে কোন্ জবাবটা পেলে খুশী হয়?

'হাওলাদার! তোমারে দাস মশয় বোলাইছেন।' খবর জানায় হাফেজ।

'ক্যান্? যাও, আমি আইলাম আর কি। আঞ্জু যাই—দাস মশয় বোলাইছে।'

এমন করে কোনদিনই কাশেম বিদায় নেয় না। এ যেন নতুন রীতির প্রবর্তন করল কাশেম।

চরের প্রায় মাঝ বরাবর একটি অগভীর খাল। ভাটার সময় শুকিয়ে থাকে--জোয়ারের সময় বেশ পূর্ণ হয়ে ওঠে কানায় কানায়। তার পশ্চিম পাশেই সেই বড় আম বাগানটা। ঐ আমবাগানটা ভাগ করে নিয়েছে হিন্দু পরিবারেরা।

রসময় বলে, এখন এতগুলো লোকে করবে কি? একটা কিছু না করে তো আর হাতের পুঁজি ভেঙে চিরদিন খেতে পারবে না। চাষ-আবাদে অনেক ঝামেলা। গরু নেই, বাছুর নেই, তেমন সরস এঁটেলী মাটির জমিও নেই—যাতে রুলেই ধানের ছোপা ফনফনিয়ে উঠবে। আমাদের দেশ তো আর ধানের দেশ নয়?'

'তা ঠিক দাস মশয়! ধান দেখছি দক্ষিণে। এক একটা ছোপার সংগে মইষ বাইন্ধা রাখা যায় জোড়া সমেত।'

'আরে কাশেম! আমাদের দেশে সবখানে ধান হয় না বটে, কিন্তু বার মাসে চৌদ্দ কৃষি নামে—পাট, তিল, মুগ মুসুরী, কলাই, হলুদ। গৃহস্থের কোনটায় না পয়সা?'

'কিন্তু যাই কন দাস মশয়, ধান তো না যেন মা লক্ষ্মী—দেখলে চক্ষু জুড়ায়, বুকটা ঠাণ্ডা হয়। পয়সা কম কিন্তু চান (আয়) বড় বেশি।'

হাফেজ বলে, 'জমি জুত হইতে দেরি হইবে, এখন করি কি? টাকা পয়সা কার হাতে কি আছে না আছে তা তোমার জানতে বাকি নাই।

কৈবর্তরা বলে, 'জাল বাওয়া, মাছ ধরা প্যাশাটা খারাপ না। যেমন টাকা পয়সা লাগে কম তেমন আছে কাজে।'

ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে।

এমন সময় সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহ ঘুচে যায় একটি লোকের আকস্মিক আবির্ভাবে।

'নমস্কার দাস মশয়, আদাব ভাইজানেরা।' জীবন এসে তার বোঁচকা নামায়। কাশেম উঠে গিয়ে তা তুলে রাখে, রসময় নিজের হোগলার পাশে তাকে টেনে বসায়।

জীবন পিওন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করে, 'এখন বলেন কেমন আছেন সব?'

'ভাল—আপনি? কোত্থেকে এলেন? আজ রাতটা তো নিশ্চয় আছেন?'

'হ্যাঁ এখন আর তো বেলা নাই? এই পথ ধইরা-ই ফিরছিলাম। ভাবলাম একবার দেইখা যাই আপনাগো।'

রসময় মহাযত্ন করে জীবনকে তামাক খাওয়ায়।

'কি পরামশ্ব হইতে আছিল কাশেম? সব যে জমায়েত হইছ?'

কাশেম সব খুলে বলে। জীবন হালদার তামাক টানতে টানতে মন দিয়ে শোনে।

'ওপার তোমরা ক্যান ছাড়ছ? ছাড়ছ রুজির অভাবে আর পুলিশের উপদ্রবে। যার জমি জায়গা নাই, সে ভাল হইলেও চোর— মন্দ হইলেও চোর। কি কও?'

'হয় হালদার মশয়।'

'তোমাগো চোর কয় কারা? জোতজমিন যাগো আছে, কি তালুক-মুলুকের অধিকারী যারা—এই নিবারণ ও পঞ্চাইতের দল ওরাই কিন্তু তোমাগো সর্বস্ব হরণ করছে—সুযোগ বুইঝা টাকা পয়সা দাদন দিয়া, জমিজমা বন্ধক রাইখা, না হইলে কবলা কইরা। হয়ত কারোর কারোরটা নিছক আদালতের পিওন পেশকারের যোগাযোগে গোপনে নিলাম কইরা নিছে। সকলেই কি এমনি ভূমিহীন বিত্তহীন আছিলা? বাপ-দাদার আমলেও কি কারোর জমিন আছিল না এতটুকু?'

একটা গুঞ্জন শোনা যায়। ছিল—ছিল সকলেরই সব। ছিল—জায়গা, জমি, হাল, গরু। পূর্ণ ছিল সবই। সুখী ছিল তারা।

রসময় রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল এতক্ষণ। 'আহা—তোমরা চুপ করো, বলতে দাও হালদার মশাইকে।'

'তোমাগো সমস্ত যারা কাইড়া নিছে তারা এখন সর্বনাশা ভাঙনের মুখে বইসা দিন গোণে।' জীবন পিওন বলে, 'তোমরা বাপজানেরা টাকা পয়সার অভাবে

আর ওদের কাছে যাইও না, সাপের গত্তে হাত দিও না। যদি এখন হাল গরু না-ই জুড়তে পারো, পিছু হইটো না। নিজেদের চেষ্টা-তদ্বিরে কিছু জমাও, একটা এজমালী কাজ কারবার করো। খাটো সবাই মিইলা, মুনাফাও ভাগ কইরা নেও আপুষে। নতুন চরে আইছ—নয়া পথ ধইরা চলো। মন্দ না ত মাছের ব্যবসা। চরের কোলের মাটি আর একটু শক্ত হউক, ডুবন্ত চাইরদিক আর একটু জাগুক—তখন তোমরাও অনেক শক্ত হইবা। দেখবা, সক্কলডির চেষ্টায় পাঁচখানা হাল জোড়াও কঠিন না। দুনিয়ায় কিছুই কঠিন না—হাতে হাত মিলাইয়া চললে।'

রসময় জীবন পিওনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে যেন মুখখানা টস্‌টস্ করছে। বার্ধক্য একে জড়তা দেয়নি, দিয়েছে তীক্ষ্ণ ঋজু দৃষ্টি। রসময়ের জীবনকে এক সময় ঋষি বলে মনে হয়। চরকাশেমকে মনে হয় তপোবন।

'দাস মশয়!' কাশেমের ডাকে সম্বিৎ ফেরে রসময়ের। 'তামাক সেবা করেন।'

সকলেই রাজী হয় জীবন পিওনের উপদেশ মানতে।

'ধীরে ধীরে হালুটি করতে পারবা রহিম—এখন তো চরের অনেক জমিতে ফসল হইতে ঢের দেরি। তবে কিছু কিছু চৈতা-বোরো (এক প্রকার ধান) রুইয়া দেখতে পারো নদীর লামা-চরে। তাতে লাঙল দিতে হইবে না।' সে মনে মনে ভাবে, ওখানেই তো পলিমাটির লাবণ্য। হয়ত মা লক্ষ্মী ধন্য করে দিতে পারে গরিবের আশা।

সকলের পেশা স্থির হয়, শুধু বাকি থাকে রসময়েরটা। তার দিন গুজরানের ব্যবস্থা হবে কি?

সকলে বলে, 'দাস মশয়ের চিন্তা নাই, দুই জন মানুষ, আমরা কয়জনে টাইনা রাখুম।'

জীবন বলে, 'আপনি ওগো ছেইলা মাইয়া একটু বড় হইলে পড়াইবেন, আপনিই তো মুরুব্বি চরের।'

এ কথায় রসময় তুষ্ট হয়। খুব ফলাও করে সন্ধ্যামণিকে গিয়ে বলে, 'শুনেছ —ওরা সব আজ বলেছে কি? আমার নাকি কিছু করতে হবে না। শুধু—'

'পঙ্গু হয়ে বসে থাকতে হবে—সেটাও একটা কম মেহনতের কাজ নয়। এত বড় আলসেও আমার ভাগ্যে জুটেছিল।'

তারপর থেকে রসময় ডালা কুলা ধামা বুনতে আরম্ভ করে। বাকি সময়টা সে কাটায় দেবসেবায়।

১৩

রাত্রে একা একা শুয়ে কাশেম ভাবে ঘর-দুয়ার হল। পেশাও সকলের একটা কিছু স্থির করে দিলেন হালদার মশাই, তবু যেন নেশা ধরছে না। যে নেশায় অধীর হয়ে মানুষ কাজ করে। পাগল হয়ে সংসারের পাকে পাকে ঘুরে বেড়ায়। তার ওপর এ দুনিয়ার যেন কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত নেই। সকাল সন্ধ্যা দুপুর তার কাছে সব সমান। সমান ঘর বাহির।

সকলে যখন ডোঙা ডিঙি নিয়ে মহা আনন্দে নদীর ঘূর্ণিজলে ঘুরে ঘুরে টোপ ফেলে, তখন কাশেম বাড়ি বসে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে যে শরীর ভাল না। আজ নয় কাল যাবে সে বঁড়শি বাইতে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সকলে মাছ বেচে সওদা বেসাতি নিয়ে বাড়ি ফেরে। তারা যে বাড়ি ফিরেছে তা বোঝা যায় তাদের ভাটিয়ালী গানের সুরের ছন্দে। সুরের সংগে নানা সংকেত ছড়িয়ে পড়ে চরকাশেমের ঘরে ঘরে। ছেলে মেয়ে বৌ-ঝির খেলা-ধুলা কাজ-কর্ম সব ওলট পালট হয়ে যায়।

তাদের দীর্ঘ দৃপ্ত পদক্ষেপে চরকাশেম চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে কোনো একজনের দাওয়ায় একে একে সকলে হাজির হয়। তারপর হিসাব নিকাশ চলে কাজ-কর্মের।

কাশেম তাদের বৈঠকে হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হয়। 'তোমার একনালীডা (তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষ) দেও তো রজনী।'

'কোনডা ?'

'বড়ডা।'

'কি করবা ?'

'এখন কমু না। ··কমু কি, গাঁইথা আইনা দেখামু।'

'যামু নাকি সঙ্গে ? আমার কাছে আরও অস্তর আছে।'

'কি ?'

'মুঠুম হাত ট্যাডা। কাইল ধার দিয়া রাখছি ঝকঝইক্কা কইরা। একটু রক্তের পোম পাইলে আর ফেরবে না।'

'তয় সেইডাই দেও।'

'কি মাছ ? কও না হাওলাদার ?'

রহিম বলে, 'কও মিঞা—কও। কারো লোভের পানি পড়বে না ভাগের লাইগা।'

'এমন মাছটা কি হাওলাদার ?' রজনী জিজ্ঞাসা করে।

'ঢাইন (বড় শিলন মাছ)।'

তারপর কাশেম একটু হাসে—যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে অন্ধকারে। অবশেষে সে দাওয়া থেকে নেমে যায়।

সেদিন আর রজনীর দাওয়ায় কোনা গল্প জমে না। মাছের মধ্যে সেরা মাছ ঢাইন। সেই ঢাইনের কথাটাই তো অসমাপ্ত রেখে গেল কাশেম।

রহিম বাড়ি ফিরে আঙ্গুকে বলে 'আইজ কাইল যেন হাওলাদারের কি হইছে! কথা কয় সব ঘোরপ্যাচ দিয়া। গেল ঢাইন কোপাইতে সঙ্গে নিল না কেউরে। ক্যান্ আমরা কি বখরা চাই নাকি!'

'যদি চাইয়া বসেন। জাউলায় কি মেহনতের ভাগ ছাড়ে—বিশেষ কথা পুরুষ জাউলায় (জেলে]।'

'তুমিও দেখি হাওলাদারের মত প্যাচ মারতে শেখছ। কও না কথাডা খুইলা।'

'গেছে ফুলমনেরে ছিনাইয়া আনতে।'—আঙ্গু এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে বলে, 'কাইল নাকি ওর বিয়া। ঐ রোশনাই দেখেন না পুবপার গাঙের কোলে বড় নারকোল গাছটার মাথায়! পঞ্চাইত বাড়ির বিয়ার নিশানা। সাত রাইত আগে বাত্তি জ্বালে, আজ ছয় রাইত।'.

'হাওলাদার পাগল। এমন কামেও যায় একলা। মাথাডা যদি কাইটা রাখে পঞ্চাইতেরা। আমরা চরে এতডি মানুষ, আমাগো তো আব্বান (আহ্বান) করা লাগে। পঞ্চাইতেরা সাতগুষ্ঠি আইলেও খোদার রহমতে পারবে ক্যাম্ আমাগো লগে। কি আপশোষ—গেছে একলা একলা! তুমি আমারে একটা লণ্ঠন দেও—কি আপশোষ…।'

লণ্ঠন খুঁজে জ্বালিয়ে নিয়ে বের হতে আঙ্গুর দেরি হয়ে যায়। সে চেয়ে দেখে দাওয়ায় রহিম নেই। এই আঁধিয়ার রাতে রহিমও গেল একা একা। যে হাওলাদার সত্যই একটিবার আহ্বান পর্যন্ত করল না তার স্বামীকে, তারই সাহায্যে তার অগোচরে যাওয়ার অর্থ কি? যদি আনতে না পারে ফুলমনকে

ছিনিয়ে—নাই-বা পারল। কি এমন প্রয়োজন ফুলমনকে এই চরকাশেমে? ফুলমন নাকি রূপসী—আর এ দুনিয়ায় সব মেয়ে বুঝি তার বাঁদী অথবা দাসী? ও রূপসীর এখানে না আসাই ভাল। তবে, কেমন করে দিন কাটবে হাওলাদারের? সে কি সাদী করবে না? ঘর সংসার পাতবে না?

না, না না—বেশ তো তার দিন কাটছে।

তবে কি আঞ্জু তাকে চায়?

না, না, না, তাও সে চায় না। তাব স্বামী-পুত্র আছে; একটা দমকা বাতাসে ঘরের আলো নিবে যায়। অন্ধকারে টস টস করে চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জল।

ফুলমন আসুক।

আসুক আসুক—আল্লা, সব ঐ নদীর ঘোলায় ডুবে মরুক। আঞ্জু আর ভাবতে পারে না। ঘোলার চেয়েও বেশি ঘুরপাক খায় তার মগজটা। আল্লা রসুল···!

দেখতে দেখতে সাতখানা সাত দাঁড়ে ছিপ, ডিঙি ভাসে গাঙের জলে। জেলের হাতিয়ার জিলজিল করে অন্ধকারে। রহিম মুরুব্বী হয়ে নির্দেশ দেয়। নৌকা ছোটে ছলবলিয়ে।

গাঙের জল কেটে জেলেরা চলেছে। দাঁড়ীরা অন্ধের মত দাঁড় ফেলছে—মাঝিরা হুঁসিয়ার। নদীটাকে ওরা চারটা রেতে (স্রোতে) ভাগ করে। প্রথম রেতে চলে 'পাড় ঘোলানী' জল। দ্বিতীয় রেতে 'নাও দোলানী' সোঁত। তৃতীয় রেতে 'আশমান টলানী' ঢেউ। যে ঢেউ দেখলে—অবশ্য বর্ষাকালে—খোদাও নাকি ভয় পায় একা পাড়ি জমাতে। চার রেতে সেই আবার 'পাড় ঘোলানী' জল।

এখন গাঙ অবশ্য শান্ত। তবে শান্ত নয় চরকাশেমের অনুচরদের মন। তারা জোর জোর দাঁড় ফেলে। চায় কাশেমকে। কিন্তু এপারে এসে দেখে কাশেম নেই। জেলে ডিঙি একখানাও নদীর জলে ভাসছে না। ভাসছে শুধু বড়বড় কোষ আর দু একখানা কোষের সমান ঘাসি নৌকা। আলো জলছে প্রত্যেক নায়ে।

আলোর আবডালে রহিম ইসারা করে নৌকা রাখতে। সাতখানা ডিঙি ভেড়ে হাতিয়ার সমেত একটা ভাঙনের কাছে। ঝুলে পড়া গাছের সঙ্গে ওরা নাও বেঁধে চুপ করে থাকে।

রহিম ওপরে ওঠে একটা গাছ বেয়ে। উঠে ভাবে কোথায় যাবে হাওলাদারকে খুঁজতে? বিয়ে-বাড়ি তো যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু অন্য কোন্ বাড়ি যাওয়া যায়? এপারের কারুরই তো তেমন আর টান নেই ওদের জন্য। তবু রহিম এদিকে সেদিকে খোঁজ করে—কিন্তু কোন হদিস পায় না কাশেমের।

সারা রাত ডিঙি সাতখানা নদীর পারে থাকে। ভোর ভোর সময় পাড়ি দিয়ে যায় ওপার।

রসময় সারারাত ঘুমায় নি। নদীর চরে চরে শুধু পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। খুব ভোর বেলা স্নান করে তার নিত্য নৈমিত্তিক পুজা আহ্নিক শেষ করেছে। কিন্তু সুস্থ হতে পারেনি। সে এসে আঞ্জুদের উঠানে বসে রয়েছে। সে জানে যে এসব ব্যাপারে একটা মামলা বাধলে গুরুতর দণ্ড অনিবার্য—কারণ স্ত্রীলোকটি অবাধ্য। হয়ত খুনখারাপিও হতে পারে। জুলুম জবরদস্তির কাজ! আঞ্জু কিছুই বলে না।

দলবল সমেত রহিমেরা বাড়ি ফেরে।

'সংবাদ কি?'

'খোঁজই পাইলাম না মিঞার।'

'এখন কি করবে?'

'আইজ রাত্তিরডাও ভোগ করতে হইবে। আছে মিঞা ঐখানেই।'

বাস্তবিকই কাশেম রয়েছে এখানে। বিয়ের রাত্রে রাত আট নয়টার সময় সে শিকারী নেকড়ের মত পঞ্চাইতের হারেমে প্রবেশ করে। কোথায় ফুলমন?

শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে কাশেম।

আজ ফুলমনকে পাওয়া কঠিন। সে তার সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত সখীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে। এবার তার সম্বন্ধ এসেছে পছন্দ মত। যেমন ঘর তেমনি বর। গর্ব ও গৌরবে হয়ত তার বুকখানা ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে।

চারদিকে আলো জ্বলছে ঝলমলিয়ে। ফুলমন তো নয় যেন বাদশা মহলের বেগম—এমনিভাবে সাজ সেরে বেরিয়ে আসে দর্পিণী। চোখে সুর্মা, নাকে নথ, নখে মেহেদির টাটকা রং। ওড়নায় ঝিকমিক করছে যেন হাজার জোনাকী।

হঠাৎ লাঠির ঘায় ঝাড়-লণ্ঠন ভেঙে পড়ে গোটা দুই।

কাশেম ফুলমনকে ধরে গিয়ে বিবিমহলে। একটা যেন রক্তলোভী নেকড়ে। আদিম বর্বর ক্ষুধায় সে অন্ধ। অন্ধ তার ফলাফল জ্ঞানে।

এক হাতে তার খোঁপার বেণী, অন্য হাতে শাণিত অস্ত্রের উন্মুক্ত ফলক। ফুলমনের পিঠে মৃত্যুর অনুভূতি ঠেকান।

একটা হৈ চৈ চিৎকার·· তারপর শোনা যায় হট্টগোল।

'মার মার ধর ধর'···

'এ পথে নয়···ঐ পথে···'

কাশেম নামে গিয়ে খাড়ি-পাড় বেয়ে। ফুলমনের চুলের মুঠি তখনো শক্ত হাতে ধরা। সে স্তম্ভিতা। একটা ধারাল অস্ত্র তখনো তার পিঠের সংগে ঠেকান।

'কথা কইলে খুন করুম। চল্, ওঠ, সোজা নায়ে।'

এত বড় অহংকারী মেয়ে কলের মত কাজ করে।

পঞ্চাইতের দল কাশেমকে ধরতে চেষ্টা করে—এগিয়ে আসে কোষ নৌকা।

এখন একটা রক্ত গঙ্গা হবে এখানে।

কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে কোষের কাছি কেটে ঢুকে পড়ে সাতখানা জেলে ডিঙি।

কাশেম সুযোগ পায়। সে তার ডোঙায় চড়ে তিন টানে গিয়ে পড়ে গাঙের দ্বিতীয় রেতে। খানিকটা সে আড়াআড়ি পাড়ি জমিয়ে টান দেয় সোজা দক্ষিণে ভাটার গতির মুখে। আগুন জ্বলে বৈঠায়···শক্তি ও হিম্মতের আগুন।

কৃষ্ণপক্ষের রাত না হলেও—গ্রামগাঁয়ের পথে, বাড়িয়ালের আনাচে কানাচে ঘোর আঁধার—কিন্তু ঝিকমিক করছে দরিয়ার বুক নির্মল আকাশের অসংখ্য তারার ফুলকিতে। কূলে কূলে ছুটে চলেছে দিশেহারা জোনাকী, তার সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড়ের ঘনায়মান অন্ধকারও যেন ছুটতে শুরু করেছে কাশেমের পিছে পিছে। কিন্তু কাশেমকে আজ ধরে কে? ডোঙাখানা তো নাও নয়—যেন এক টুকরো উল্কা।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে জেগে ওঠে যেন সিংহিনী। ফুলমন ধড়মড় করে উঠে নৌকার বাঁকের ওপর সোজা হয়ে বসে। অবস্থাটা সব স্মরণ করে ধাক্কা মারে কাশেমের বুকে, 'বেইমান দিয়া আয় আমারে।'

ধাক্কাটা বেশ জোরেই লাগে কাশেমের বুকে। সে চিৎ হয়ে পড়ে যেত নদীতে, যদি না সে পা দুখানা ফুলমনের দুপাশ দিয়ে প্রসারিত করে ধরত

বঁড়শির মত নায়ের একটা গুঁড়ি। খুব কৌশলে কাশেম প্রথম চোট এড়িয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আসে আবার প্রচণ্ড ধাক্কা। তারপর আবার তারপর বারবার······

এক ঢলক জল ওঠে। হাতের বৈঠা এদিক ওদিক হয়ে যায় কাশেমের। জোয়ান মেয়ে, সমবয়সী—তাকে সামলান যে সে কথা নয়। গাঙে তুফান না হয়ে তুফান হচ্ছে নায়ে! আর একটু কাৎ হলেই ব্যস, 'হারামজাদা কাশমা তোর মুখে মারুম লাথি। ফের হারামী, ফের।'

'ফুলমনরে, গজাইলার ঘোলা···আর বুঝি ফিরাইবে না খোদা—চুপ কর, বৈঠা ছাড়—একটা পাক খাইছে নাও।'···

অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ফুলমন চিৎকার করে কাশেমকে জড়িয়ে ধরে। সত্য সত্যই নাও ঘুরছে!

কিন্তু হাসছে কাশেম। এতদিন পরে তাকেই আশ্রয় করে, তার বুকেই মুখ লুকিয়ে চুপ করে আছে ফুলমন। হোক ক্ষণিকের—তবু তো আত্মসর্পণ, বান্দার কাছে হার মেনেছে বেগম!

১৪

পঞ্চাইত বাড়ি প্রায় পাঁচশ লোক জমা হয়েছে। কাছারীবাড়ির উঠান থেকেও বোধ হয় বেশি লোক জড়ো হয়েছে অন্দর মহলে।

'এমন অসম্মান কইরা যায় কাশেম! হুকুম দাও মিঞা ভাই ওরে গোলাউ করি।' বন্দুক হাতে রুখে ওঠে পঞ্চাইত।

ঢাল সরকি নিয়ে পায়তারা করে গ্রামের বাধ্য রাইওত, এবং খাতকের দল। তারা দাড়িতে হাত বুলায় আর হুংকার ছাড়ে। তামাক পোড়ে প্রায় সোয়া সের। আসে জব্বর, জুলফিকার, করিম।

অন্দরের বিবিরা আবার কেঁদে ওঠে। এবার শোকে নয়—ভয়ে। আবার কাশেম এলো নাকি? ছোট বিবি জড়িয়ে ধরে আম্মার (মায়ের) বয়সী বড় বিবিকে। বড় বিবি এতক্ষণ কেঁদেছে কিন্তু এবার কান্না থামিয়ে তাকে কেবল জবাব দিতে হচ্ছে প্রতিবেশিনীদের প্রশ্নের। মেজো আর সেজো পান দোক্তা জোগাচ্ছে। তারাও এতক্ষণ কম কাঁদেনি। মোট কথা অন্দরে বাইরে এবং নদীর পাড়ে এমন একটা হট্টগোল চলছে যা সাতটা মেয়ের বিয়েতেও হয় না।

যারা যারা এ গাঁয়ের মাতব্বর সকলেই এসেছে। নিবারণ মহাজনও লাঠি হাতে এসে উঠেছে কাছারিতে।

'আরে বইতে দাও, বইতে দাও মহাজনেরে।'

'কি, ব্যাপারটা কি পঞ্চাইত—বলো তো আদ্যপান্ত?' নিবারণ ভাল করে একটা বেতের মোড়ায় বসে তামাকের জন্য এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। 'দোষ কাশমার না—আমি আগেই বুইঝা আইছি এর মধ্যে নেহাৎ ষড়যন্ত্র আছে।'

'কি ষড়যন্তর?' মকবুল চাপরাসী জিজ্ঞাসা করে।

'তোমাগো আর এই পারের সব বাসিন্দাগো হীন কইরা রাখতে চায়।'

'সে ক্যামন? আসেন মহাজন, পান লন, তামুখ খান।'

'চরকাশেমে বইসা কল টিপছে আসল কাশেম। আর নকলটা তো ঢাকের বাঁয়া—থাবড়া মারলে ঢ্যাব ঢ্যাব করে। না হইলে এতগুলা সাক্ষী সাবুদের সামনে কেও এমন কইরা ছিনাইয়া নিয়া যায় বিয়ার কন্যা? পুলিশ ডাকো, দেখবা এই ঠেলাতেই চর যাইবে উজাড় হইয়া।'

'এ কথাডা কইলেন কি মহাজন—পুলিশ ডাকুম, কখন তারা আইবে, কখন তারা চরকাশেমে যাইবে, ততক্ষণ আমরা বইসা থাকুম? আমাগো যে মুখে থুথু দিবে অতিথেরা। তয় সরকার বন্দুকের পাশ দেছে কিসের লাইগা। মিঞা ভাই কউক, হুকুম দেউক, আমি গোলাউ কইরা দি শালারে।' অধীর পঞ্চাইত নিজের অজ্ঞাতেই কয়েকটা পান মুখে দেয়।

'ঠিক কইছেন পঞ্চাইত—গায়ের রক্ত গরম থাকতে থাকতেই বিহিত করা উচিত।'

নিবারণ বলে, 'আরে থাম্ থাম্ মদনা—সব জায়গায় আর কচু ঘেঁচু বেচো না। কাশেম কোথায় যে তাকে গুলি করবা? নিজের বাড়ি বইসাই এতগুলা লোকে একটা বিড়াল রুখতে সাহস পাইলা না, এখন আন্দাজে গোলাউ করবা জলে!'

'ক্যান তার বাড়ি যাওয়া যাইবে না?'

'পারবিনা ক্যান! রমণী শীলের ক্ষুর গাছা তুই নিয়া যাইস। জানিস, এর পিছনে বৃহৎ একটা ষড়যন্ত্র আছে? আসল কাশেম আবডালে?'

'কন মহাজন কেডা, সেই শালারেই গোলাউ করুম।'

'একেই বলে মর্দানী, পারো তো তাই করো। আবডালে বসে কল টিপছে রসময়।'

মকবুল চাপরাসী বলে, 'হিন্দুর মগজ ছাড়া এমন বুদ্ধি খেলে! ঠিক ধরছেন মহাজন। এখন আর দেরি না কইরা বন্দুক চালাও পঞ্চাইত।'

নিবারণ ভাবে এই হট্টগোলে যদি রসময়টা একটু ঠাণ্ডা হয় তবে চরের নিলামী জমিগুলো নিয়ে যে নিলাম রদের মামলা করার একটা আশঙ্কা আছে তা বহুলাংশে কমবে। রসময়ের কম জমি তো সে কুক্ষিগত করেনি। তাও প্রায় ছ'বছর কাবার হয়েছে। বাকি ছ'টা বছর শান্তিতে কাটলেই নিশ্চিন্ত হোত নিবারণ। সে এসেই পুলিশের কথা বলেছিল, কিন্তু এখন তা ধামা চাপা পড়েছে—ভালই হয়েছে। পঞ্চাইতের রোখটা আর একটু ঘুরুক রসময়ের দিকে। নিবারণ জিজ্ঞাসা করে, 'দাদু কই?'

পঞ্চাইত জবাব দিল, 'মিঞা ভাই কলিজায় বড় দরদ পাইছে—ঐ তো শুইয়া রইছে চুপচাপ।'

'আহা অন্যত্র গিয়া জটলা করো—দাদুকে একলা থাকতে দাও। আইজ আমি উঠি ভাই। কাইল সকালে আইসা একবার দেইখা যামু।'

নিবারণ বাড়ি চলে যায়। তার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ক্রীড়া করতে থাকে এতগুলো মানুষের মগজে। তারা এখনই চরকাশেম পর্যন্ত হানা দেবে। হাতিয়ার গোছাতে শুরু করে নানা কিসিম। আগেই আনরে রসময়কে টেনে—তারপর তার চেলা চামুণ্ডাদের। ফুলমনের কথা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এখানে।

বুকের ব্যথাটা শোকের ও অপমানের—রোগের আক্রমণ নয়। তাই ফুলমনের বাপ কাবু হয়ে পড়ে খুব। তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর নেওয়া হল। কবিরাজ আসে, কিন্তু হাতের নাড়ী দেখতে প্রায় দেড়ঘণ্টা দেরি হয়ে যায় তার। বাড়ির ভিড়ই ভাঙছে না। সকলেরই তো নাড়ী জ্ঞান প্রচুর! অবশেষে কবিরাজের ভাগ্যে যখন বুড়োর হাতখানা এসে ঠেকে তখন ফুলমনের বাপের রীতিমত ঘাম হচ্ছে।

কবিরাজ একজন জোলা—বস্ত্র ব্যবসায়ী। শাস্ত্রেও তার জ্ঞান আছে। সে খানিক ভীমার্জ্জুন-নকুল, সহদেব এমন কি রাবণের রাজনীতির ব্যাখ্যা করে। খানিক আওড়ায় হেকিমী দাওয়াইর কথা এবং কোরাণের বাণী—তারপর চার্বাক ও চতুর্মুখ এবং চ্যবন মুনির গুণ গান। সকলে তার চিকিৎসা শাস্ত্রে অপার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে 'হয়, জ্ঞেয়ানী বুঝমান কবিরাজ।'

'এখন কি করা লাগবে?'

কবিরাজ তখনও নাড়ী ছাড়েনি। সে ইংগিতে চুপ করতে বলে প্রশ্নকারীকে। বোঝা যায় সে যেন নাড়ীর শব্দ পাচ্ছে কানে।

সকলে নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

কবিরাজ একটু মুচকি হেসে মুখ ফাঁক করে। অমনি বালকের মত একটু লালা ঝরে পড়ে তার কাপড়ে। কেউ অবশ্য তা লক্ষ্য করতে পারে না। 'এখন চিকিৎসার দরকার।'

জনতা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ফুলমনের মা বলে, 'তা তো বোঝলাম কবিরাজ—একটু তাড়াতাড়ি করেন, ওষধু দেন।'

'একি তাড়াহুড়ার কাম? রোগ আদালতী, চিকিচ্ছা চাও ফৌজদারী?' কবিরাজের আবার আর এক ফোঁটা লালা ঝরে। সে পোঁটলা খোলে ওষুধের। একটা উগ্র হিংয়ের গন্ধে ঘর ভরে যায়। তেজী ওষুধ বটে।

ওষুধ খাবে কে? খাবি খাচ্ছে বুড়ো। কান্নার রোল ওঠে বিবি মহলে।

কেবল ছোট বিবি কাঁদে না। সে ঘরে গিয়ে কপাট দিয়ে একখানা ফটো তার তোরঙ্গ খুলে বার করে। তার তো বিয়ে হয়েছে অল্পদিন। তোরঙ্গটা বেশ চকচকে আছে। তার চেয়েও যেন চকচক করছে ফটোর বুকে একটি সুন্দর যুবকের মুখ। নীচে লেখা—'তোমার সিরাজ। বি. এম. কলেজ।'

যেমনি কবিরাজ উঠানে নামে—আদালতী রোগ অমনি ফৌজদারী ঝোঁক নেয়। পাঁচ মিনিটে সব কাবার। বাড়ির ভিতর আবার একটা কান্নার রোল শোনা যায়। ছুটে আসে ছোট ভাই পঞ্চাইত।

বাড়ির সুমুখে জুম্মা মসজিদে শোনা যায় কোরাণ পাঠ। আরবী আয়াত্ (শ্লোক) গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে এক দীর্ঘাকৃতি মৌলবীর কণ্ঠ থেকে। সমস্ত হৈচৈ গণ্ডগোল যেন নিমেষে মিলিয়ে যায়। তার বদলে পড়ে শোকের মর্মস্পর্শী ছায়া। লাঠিসোটা ছেড়ে সকলে কান পেতে শুনতে থাকে ঐ কোরাণের মর্মকথা—আর বুঝি ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে রোজ কেয়ামতের দিনটি। এমনি একদিন সাঙ্গ হবে সকলেরই খেলাধুলা। এমনি একদিন ভোর অথবা সন্ধ্যাবেলা—দিনান্তে নিশান্তে নয়ত বা খর দ্বিপ্রহরে। হয়ত বা রাত্রির প্রথম যামে।···

মুর্দা (মৃতদেহ) নিয়ে যাওয়া হয় গোরস্থানের নিকটে। প্রাচীর ঘেরা পারিবারিক গোরস্থানটি জুম্মা মসজিদের পাশেই।

তারপর মৃতদেহকে গোসল (স্নান) করান হয় গোলাপ জলে। নাকে ও কানে দেওয়া হয় দামী আতর। আড়ম্বর করে পরানো হয় পরিমিত মূল্যবান বস্ত্র। কেটে ফেলা হয় তার হাতের সোনার মাদুলী দুটো। ছিঁড়ে ফেলা হয় তাগা।

দেখতে দেখতে কবর খোঁড়া শেষ। ভোরের আলোতে হাসছে যেন মাটির বুকের কবরটি দেখে ফুলমনের বাপ। ঐ সুশীতল চিরন্তনী মাটির কোলে মাথা রেখে এবার ভুলবে এই দুনিয়ার যত মনস্তাপ। শবের কোলে দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে 'জানজা' পাঠ করে সকলে।

হঠাৎ মৌলবীর অমিয় কণ্ঠ পরুষ হয়ে উঠে। 'এ জীবনে বহু গোনাহা (পাপ) করেছে—করেছে অসৎ পথে ধন-সঞ্চয়। তার জন্যে তোমরা কি ছদকাহ্‌ দেবে তাই বলো? বহুৎ রোজা নামাজ তালুকদার কাজা (বাদ) করেছে, লাভের নামে অনেক সুদ খেয়েছে মকবুল ময়জদ্দি এবং আরো অনেক নিঃস্ব খাতকের কাছ থেকে। যদি তোমরা ছদকাহ্‌ না দাও তবে জেনো এর রক্ষা নেই আজগাই দোজক থেকে।'

একটা ভীতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ইহকালে দাঁড়িয়ে পরকালের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ে আত্মীয় স্বজন। তারা স্বীকার করে একশ জন 'মমিন' মুসলমানকে খাওয়াবে এবং একটা বকরী কোরবানী দিয়ে সারা গাঁয়ে বিলিয়ে দেবে মৌলবী সাহেবের ইচ্ছা মত। মকবুল ও ময়জদ্দিরাও সে মাংসের অংশ পাবে। কত ধন দৌলত জায়গা জমি রেখে গেছে এই শঠ তালুকদার—শঠ তো নয় বুদ্ধিমান তালুকদার—যদি এত অল্পে তার পরকালের পথ নিষ্কণ্টক হয় তবে দোষ কি?

কোথা থেকে যেন ফরিদ্‌ এসে দাঁড়িয়েছে, সে ভাবে : এ দুনিয়ায় একটি মেলে না, এরা একশটি মমিন মুসলমান পাবে কোথায়?

ফুলমনের বাপের হাসি হাসি মুখখানা যেন আর একটু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোরে আশ্রয় নেওয়ার প্রাক্কালে। সে যেন বলতে চায় : 'আদাব মৌলবী ছাহেব, আদাব। আমার মত তালুকদার জোতদার ভাইরা আপানাদের বান্দা হইয়া থাকবে চিরকাল। আদাব মৌলবী ছাহেব, আদাব।'

গোরস্থান থেকে ফিরে আর চরকাশেম যাওয়ার জন্য কারু হাঁটু ওঠে না। পঞ্চাইত চলে থানার দিকে। বিদায় হয় বিয়ের অতিথিরা বিমর্ষ মুখে।

কিন্তু সহর্ষ হৃদয়ে ছোট বিবি আবার তোরঙ্গ খোলে। এদ্দাতের মেয়াদ অতীত হওয়ার আগেই সে একটি ঘন চুম্বন এঁকে দেয় সিরাজের মুখে।

১৫

'আসুন পঞ্চাইত সাহেব। সংবাদ কি?'

'সংবাদ ভাল না হুজুর।' একজন চৌকিদার সেলাম দিয়ে বলে, 'তালুকদার ছাহেব মারা গেছেন।'

'বুড়ো মানুষ—মারা গেছেন সে তো ভালই। নিমন্ত্রণ কবে পঞ্চাইত সাহেব?

পঞ্চাইত দেয়ালের গায় ঝুলান হাতকড়িগুলো ও মোটা মোটা দড়িগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। মনের চেয়েও মুখখানা অতিরিক্ত ম্লান করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘন দাড়ি গোঁফের মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট করে তোলা বড় কঠিন।

দারোগা বাবু হাতের কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল ফাইলটা সরিয়ে রেখে বলেন, 'তা তেমন দুঃখের কি?'

এবার পঞ্চাইত সব খুলে বলে। কাশেমকে জড়ায়, তার আশপাশ কাউকে বাদ দেয় না—রসময়কে জড়ায় একটু বেশি করে। পরামর্শ ও ফিকির ফন্দির অন্ধি-সন্ধি সে না কি বাতলে দিয়েছে। নয়তো কাশেম কিছুতেই সাহস পেত না এসব করতে। কাশেমকে পঞ্চাইত চেনে ছোটকাল থেকেই।

'আপনি বলছেন কাশেমের তেমন দোষ নেই—তবে কি রসময় এসেছিল ছিনিয়ে নিতে?'

'আহা তা আইবে ক্যান্? পরামশ্বডা ওর। কল 'কাশমা'—টিইপা চালায় রসময়।'

'এ মামলার এজাহার নিয়ে হবে কি? জেরার মুখে টিকবে না কোর্টে।'

'ক্যান্ টেকবে না। ইনশা আল্লার মর্জিতে হাজার সাক্ষী জোগাড় করুম আমি।'

'কিন্তু রসময় যে ফুলমনকে ছিনিয়ে নিয়েছে তা হাকিম বিশ্বাস করবেন না। একে রসময় হিন্দু, তাতে, বুড়ো মানুষ।'

পঞ্চাইত এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। যদি আসার সময় মনে করে নিবারণকে সঙ্গে আনা হতো, তা হলে কি উপকারটাই না হতো এসময়।

আবার দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'ফুলমন কি রসময়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, মিথ্যা সাক্ষী ?'

পঞ্চাইতের বদলে একজন বুড়ো জমাদার বলে, 'ফুলমন কারুর বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেয় কিনা তাই দেখেন না !'

দারোগাবাবু শুদ্ধ অবাক হয়ে যান। 'ভাল কথা বলেছেন জমাদার সাহেব— এজাহার না নেওয়াই উচিত। শুধু শুধু কাগজ নষ্ট করে লাভ কি ?'

'ক্যান্ ক্যান্, সাক্ষী দেবে না ক্যান্ ফুলমন ? ও আমাগো মাইয়া না ?'

দারোগাবাবু মাথা নীচু করে কি যেন পড়তে থাকেন। পাহারাওয়ালা থানার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হেঁটে বেড়ায়। একটা আসামী হাজত ঘরের গরাদে এসে কি যেন চেয়ে দেখে। হয়ত ঘড়িটা।

গ্রামের চৌকিদার বলে, 'মাইয়া তো আমাগো কিন্তু যাইয়া ওঠছে যে পরের ঘরে।'

'তাতে হইছে কি ?'

এসব ক্ষেত্রে কি যে হওয়ার আশঙ্কা থাকে তা চৌকিদার আর পঞ্চাইতকে বোঝাতে চায় না। মুরব্বির কাছে সব কথা তো আর খুলে বলা চলে না।

'আপনারা এজাহার না নিলে আমি উপরে যামু—এমন অসোম্মান, মিঞাভাই মইরা গেছি।'

'জমাদার সাহেব দেন তো প্রথম এত্‌লার বইটা। পঞ্চাইত সাহেব যখন একেবারে ছাড়বেন না তখন আর উপায় কি !'

এজাহারের খাতায়, যা যা পঞ্চাইত বললে তা সবই লিখে নেন দারোগাবাবু। নিবারণের উপদেশ মত পঞ্চাইত রসময়ের গলায়ই শক্ত করে দড়ি জড়ায়। তারপর হেসে বলে, 'মাইয়া আমাগো বাঘিনী—কোন ভয় নাই দারোগাবাবু। বাঘে শিয়ালে মিশ খায় না।'

১৫

একথা অবিসংবাদী সত্য নয়।

ফুলমন ভীতা বাঘিনীর মতোই জড়িয়ে ধরে কাশেমকে। গজালিয়ার ঘোলা কি যে দুর্নিবার বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে উত্তর হতে দক্ষিণে নদীর ভাটির দিকে প্রতি বছর নেমে যায় তা ফুলমন কেন, এদেশের সকলেই জানে। এই

ঘোলার কবলে পড়ার অর্থ যে কি তাও সকলে জানে। মুহূর্তে—মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে নদীর ঘোলাজলের ঘোলানীর সঙ্গে পাতালে তলিয়ে যাওয়া। ফুলমন মনে মনে অনুভব করে সে ভয়ঙ্কর আবর্ত। তাই চুপ করে কাশেমের কোমর জড়িয়ে তার কোলে মাথা ডুবিয়ে পড়ে থাকে।

কাশেমের দুঃখ হয়। ভীরু একটি রম্য মাছ যেন তার কবলে পড়ে কাঁপছে। আহা—সে ছেড়ে দেবে নাকি বঁড়শি খুলে? এতো মাছ নয়—তার চেয়েও মোলায়েম। তার চেয়েও যেন নরম ওর দুখানা গাল। একটি যেন ভীরু পায়রার ছানা। আশৈশব কাশেম ওর সঙ্গে খেলেছে, বড় হয়েছে একই ঘরে। একই অন্নে দুজনার দেহ অঙ্গ পুষ্ট। কিন্তু এই রাত্রি ও নদীর পরিবেশে সে যাকে পারাবত শিশু ভেবেছিল—সে তা নয়। সে মহাদর্পিনী এক সিংহিনী। নইলে এত ঘৃণা এত অবহেলা কেন কাশেমকে? মিথ্যা ঘোলার ভয় দেখিয়ে সে সিংহিনীকে শৃঙ্খলিত করেছে—নিস্তেজ করেছে ওর দম্ভ। এখন কাশেমই খেলছে শিকার নিয়ে পশুরাজের মত। কত যে মর্মান্তিক ঘা সে ফুলমনের সয়েছে ছোটকাল থেকে! যে সব ঘা লেগেছে ওর কলিজায়—পিট হলে কাটা কাটা দাগ থাকত। সেই সব ঘায়ের জ্বালায় ও এখন একটু মধুর প্রলেপ দিয়ে নেবে। যাবে ধীরে ধীরে নদীর ঢেউয়ে ঘুরতে ঘুরতে। থাকনা ফুলমন ওর কোলে মুখ ডুবিয়ে। শীতের নদী। কোথায় ঘোলা, কোথায় আবর্ত? শুধু চিকমিক করছে, আনন্দে হাসছে যেন ছোট ছোট ঢেউ।

কেউ নেই এপারে ওপারে। শত্রুরা ফিরে গেছে, বন্ধুরা হয়ত চরকাশেমের কাছাকাছি পৌঁছেছে। শুধু দিগন্তবিস্তারী নদীর বুকে কাশেম ভাসছে ফুলমনকে নিয়ে। যেন একটি পদ্মফুল—যা বছরে কিম্বা যুগে অথবা শতাব্দীতে জন্মে বাদশার দীঘিতে। তাই যেন চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে কাশেম। পাড়ি দিয়েছে মহাসমুদ্রের মাঝ দিয়ে!

নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাশেমের বুকে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়েছে ফুলমন। পাট করা খোঁপা ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। সাপের মত জড়িয়ে রয়েছে বেণী কাশেমের গলায়। আলুথালু হয়ে গেছে দেহের সজ্জা-আভরণ। চোখের জলে গলে পড়েছে সুর্মার সরু টান। নিটোল গালে একটা ম্লান ছায়া পড়েছে। ফুলমনের দেহের অস্পষ্ট একটা সুরভি কাশেমের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, এমন সময় রহিম এসে আঞ্জুর হাতে হাতিয়ার দিয়ে তামাক সাজে। 'হাওলাদার আইছে?'

'না—টের তো পাই নাই।'

'তবে গেল কই? বড় চিন্তার কথা। নদীতে এখানে ওখানে জল পুলিশ ঘুইরা বেড়ায়। আবার ধরা না পড়ে। যে বুদ্ধি মিঞার, গেছিল একলা একলা।'

'শা-নজর (শুভদৃষ্টি) গাঙের জলেই সাইরা আইবে ফয়জরের রোশনাইয়ে—আপনে আমি ভাবলে হইবে কি। আমে দুধে মিইশা গেছে এখন আমরা যামু আদাড়।'

'কেডা কইল আমরা যামু আদাড়ে? গোলেবাখ্‌য়ালি কন্যা চক্ষুই মেলে না—ক্যামনে হইবে কও তো শা-নজর?'

কাশেম একপ্রকার জোর করে ধরে ফুলমনকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। ওদের দিকে চাইলে বোঝা যায় ইতিপূর্বে অনেকগুলো খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। ফুলমনের চোখের সুর্মা লেগেছে কাশেমের বুকে। তার মূল্যবান বেশভূষা এমন কি জোনাকীর মত জ্বল জ্বল করা পাতলা ওড়নাখানা—তাও গেছে এদিক ওদিক হয়ে, মাঝে মাঝে ছিঁড়ে। সে প্রথমটা অনেক লড়েছে, শেষটায় বাধ্য হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু বন্দিনী সিংহিনীর মতই গুমরে গুমরে উঠছে। একি কম লাঞ্ছনা!

বধূ পরিচয় করতে একটু মধু নিয়ে আসে আঞ্জু। রহিম হুঁকো নিয়ে সসম্মানে দূরে সরে যায়। তার পরনের কাপড়খানা নিতান্ত খাটো। আজ ফুলমন আর ফুলমন নয়—হাওলাদারের বিবি, এই চর কাশেমের প্রভুপত্নী।

আঞ্জু মুখে মধু দিতে এসে এমন একটা ধাক্কা খায় যে সে প্রায় পড়ে যেতো নীচে, যদি না ধরে ফেলতে পারত দাওয়ার একটা খুঁটি। 'এত তেজ এখনও? তয় হাওলাদার এতক্ষণ বইসা করছে কি? একটুও দেখি তেজ মাইরা আনতে পারে নাই!'

'চুপ। আঞ্জু চুপ।' রহিম বলে, 'আমাগো বাড়ি অতিথ আইছে, চুপ—কয় না ওসব।'

'ক্যান্ কমুনা? মাইয়া মানুষের অত গরমাই ক্যান্?'

'সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে দুই দিনে।'

'চোরারা, ঠাণ্ডা হবি তোরা—আইল আর কি তোগো বাজানেরা। পুলিশ আসার আগে এখনও আমারে ভালয় ভালয় দিয়া আয় পার কইরা।'

রাগে দুঃখে ফুলমন কেঁদে ফেলে।

কাশেম এগিয়ে গিয়ে দেখে যে রহিম অনেক দূরে উঠানের এক কোণে সরে গেছে। সে তার সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করে। তারপর ফিরে এসে ফুলমনকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যায়। আঞ্জু এবং ফুলমন একত্র থাকতে পারবে না। দুজনেই সমান মুখ তোড়। রাগ হলে দিশা থাকবে না কারুর।

'হাত পা ধোও, ঐ পানি—বদনায়। লাগলে আরও আনাইয়া দি।'

দাওয়ার উপর বসে পড়ে ফুলমন উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে আরম্ভ করে। হাত পায়ের কাদা ধোয় কে?

এতক্ষণ বাদে কাশেম নতুন ভাবে বিব্রত হয়ে পড়ে। জোর করলে তার সঙ্গে জোর করা যায়? কিন্তু যে কাঁদে তাকে নিয়ে কি করা যায়? সে চিরদিনই ফুলমনের রাগ দেখেছে, অহংকার দেখেছে কোনদিনই এমন বুক ভাঙা কান্না শোনে নি। সে কি করবে? কেমন করে থামাবে? অবশেষে সে ফুলমনের হাত পা ধুইয়ে দিতে শুরু করে।

ফুলমন চুপ করে বসে থাকে। ভোরের আলোতে রং আরো রাঙা হয়ে উঠেছে। হাত পায়ের পাতলা ত্বকের অন্তরাল থেকে উঁকি দিচ্ছে লাবণ্যের দ্যুতি। দূর থেকে কাশেম ফুলমনকে কতই না দেখেছে—কিন্তু এমন করে দেখার সৌভাগ্য তার হলো এই প্রথম। সে তার খসখসে হাত যত দূর সম্ভব কোমল করে ধুয়ে মুছে দেয় কাদা।

ফুলমন আর কাঁদে না। সে বোঝে এই চরে বসে যতই কাঁদুক তাতে কাজ হবে না। নিতে হবে কৌশলের আশ্রয়। পুলিশ আজ হক কাল হক আসবেই। তত সময় এদের মতে মত দিয়েই চলা ভাল, নইলে হয়ত এরা তাকে এমন গুম করে রাখবে যে পুলিশ কেন তার বাবা এসেও খোঁজ পাবে না। আর উদ্ধারের কোন আশাই থাকবে না। এই বিরাট নদীর চরে কত 'ঘোপ' আছে, জলা আছে— আছে দুর্ভেদ্য ঝাড় জংগল। পা ধোয়া হলে ফুলমন ঘরে উঠে একটা ছেঁড়া হোগলা টেনে বসে। খানিক বসে থেকে তার পর শুয়ে পড়ে।

ভাবে এক দৌড়ে ছুটে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না? এরাও যেমন জোর করে ধরে এনেছে, ফুলমনও তেমনি চলে যাবে ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু কোন পথে যাবে? চরের শেষ সীমানায় গেলে না হয় নদী দেখা যাবে। তখন কোনো নায়ে কাকুতি মিনতি করে না হয় উঠে পড়া গেল। কিন্তু সেই শেষ সীমানা পর্যন্ত যাওয়াই তো দুষ্কর। হয়ত কাদায় চোরা চর রয়েছে—পা দিলেই

অতলে যেতে হবে তলিয়ে—আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। শীতের আবহাওয়ায় বড় বড় চক চকে দাঁতওয়ালা কুমীরেরও কি অভাব? কি করবে ফুলমন?··· সে আপাতত যখন পালাতে পারবে না, তখন শমনের সঙ্গে সন্ধি করেই চলবে। এ সন্ধি সদ্ভাবের নয়, সুযোগের অপেক্ষায় কাল হরণ।

একটা ছাগল দুইয়ে খানিকটা দুধ এনে খেতে দেয় কাশেম।

'খামু না ও দুধ।'

ফুলমন ভেবেছিল সন্ধি করে চলবে, কিন্তু কেন জানি কাশেমকে দেখেই ওর মাথায় খুন চেপে গেল। ওর যা মুখে আসে তাই বলে বিদায় করে দেয় কাশেমকে।

এসব কথায় কাশেম আর জবাব দেয় না। বাস্তবিকই তো ফুলমন ছোটকাল থেকে ছাগলের দুধ খায় না, এখন কি জোর করে খাওয়ান সম্ভব? আর যে তার ছেনীর মত ধারাল কথা, ও কথা তো সইতে হবে কাশেমকে যদি ঘর করতে হয় ওর সঙ্গে।

চরে কারুর বিয়ান গরু নেই। কাশেম হাফেজকে পাঠিয়ে বহু দূর থেকে কিছু দুধ সংগ্রহ করে। জ্বাল দিয়ে দেয় হাফেজের বৌ।

'ফুলমন! গরুর দুধ আনছি—এখন আর গোন্ধ পাইবা না। খাইয়া দেখ।'

ফুলমন ঘুমে।

কাশেমের মনে কি যেন চমকে উঠে। সে ফুলমনকে আর ডাকে না। দুধের পাত্র একপাশে পড়ে থাকে। যে ক্ষুধার আহার্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিল তারই ক্ষুধা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। সে এগিয়ে যায়।

ফুলমন উঠে বসে।······

'এই দুধটুকু খাও।' কাশেম কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে সংযত করে বলে, 'এই দুধটুকু ফুলমন···'

'আমার সামনে থিকা না গেলে কিছু খামু না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কাশেম। একটু নুয়ে দাওয়া থেকে নামে—অনেকটা ঝড়ে ভাঙা কলাগাছের মত।

এতদিনের আকাঙ্খা আজ কাশেমের সফল হয়েছে। সে জয় করে এনেছে তার ইপ্সিতা কামিনীকে। কাঞ্চন মূল্য দিয়ে নয়—হিম্মতের মন্ত্র দিয়ে। তবু যেন এ জয়, জয় নয়—পরাজয়ের গ্লানি দমকা বাতাসের মত ভেঙে দিচ্ছে তার পাল ও মাস্তুল। এর অর্থ কি? সে কি তবে এখনও জয় করতে পারেনি

কিছুই ? যা করেছে তাকি শুধু বাইরের একটা সামান্য আবরণ ? তুফান রয়েছে ভিতরে—ঘোর তুফান, আকাশ ছোঁয়া ঢেউ ? ফুলমনের বুকের অন্দর মহলে না প্রবেশ করতে পারলে—লুটে না নিয়ে আসতে পারলে সে রুদ্ধ মহলের আসরফি তবে সকলই কি বৃথা নয় ?

কাশেম মনে মনে অনুসন্ধান করে পথ। হতাশায় ভেঙে পড়া মন আবার দুরাশার গাঙে পাল তোলে—পাড়ি জমাবে ওপার।

'পুলিশ এলে কি করবি কাশেম ?' রসময় জিজ্ঞাসা করে, 'না ভেবে চিন্তে কি যে করলি ? এতো যেমন তেমন মামলা নয় ?'

'ভাবছি অনেক—ভাবনায় কুল নাই, এখন যা করে আল্লা।'

'সে তো কথা নয়।'

'কথা সেইডাই। আসল কথা কেউ বোঝে না। পুলিশেও না সোমাজেও না।'

রসময় একটু আশ্চর্য হয়ে যায় কাশেমের জবাবে।

'তা হলে এক কাজ কর।'

'কিছু করুম না দাস মশয়। যা করেছি, তার জন্য যা হয় হউক—আমি মরলেও আপশোষ নাই।'

'তবু একটু সাবধান হওয়া মন্দ কি ?'

'ভাইবা দেখছি অনেক, এমন কোন ফন্দি নাই। আর থাকলেও আমি করুম না। পুলিশ আসুক, যা হয় সামনাসামনি হইয়া যাইবে।'

রসময় ভাবে খুন-টুন নাকি ?

কাশেম উঠে চলে যায়। চরের সকলেই তো মরবে তার মধ্যে সব চেয়ে রসময়ের বেশি চিন্তা হয় কাশেমের জন্য। কারণ কামানের মুখে প্রথমেই সে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আর ওকে কোন আশ্বাসই দিতে পারে না রসময়।

আঞ্জু খাবার তৈরি করেছে নানা রকম। দিয়ে গেছে—সবই নীরবে খেয়েছে ফুলমন। রাত্রে সে আর কিছু খাবে না। সে ঘুমাবে। তাকে যেন কেউ আর বিরক্ত করে না। আঞ্জু সন্ধ্যা হতে না হতেই একটা বাতি জ্বালিয়ে রেখে গেছে তারও তেল পুড়ে পুড়ে প্রায় নিবে এলো। ফুলমন নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মাঝে সে কাতর শব্দ করে ওঠে গায়ের ব্যথায়।

কাশেম দাওয়ায় এসে বসে। ফুলমনের কাতর শব্দে সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে। নিবন্ত আলোর রোশনাইয়ে সে দেখতে পায় ফুলমনের গালে

চোখের জলের দাগ। তবে ও এতক্ষণ শুধু কেঁদেছে, ঘুমের মধ্যেও কেঁদে ফুঁপিয়ে উঠেছে। কাশেম এগিয়ে গিয়ে ওর গালের দাগ মুছে নেয় ওর হাতের গামছা দিয়ে।

ফুলমনের ঘুম ভেঙে যায়। তার গায় যেন হাত বুলাচ্ছে কাশেম। বাতিটা নিবে গেল। ছোট ঘরখানা গভীর অন্ধকারে ভরা। ফুলমন কাশেমকে বাধা না দিয়ে বরঞ্চ এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকে। বাধা দিলেই প্রতিবাদ অনিবার্য।

কাশেম হাত তুলে নেয়। সে চায় না যে এখনই ঘুম ভাঙুক ফুলমনের।

কিন্তু কেন জানি কেমন শির শির করে ফুলমনের মন।

অন্ধকারে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে ফুলমনের গায়। ফুলমন চমকে ওঠে। কেন কাঁদে এই কাশেম? কেন তার গায় হাত বুলিয়ে শান্তি দিতে চায় তাকে? ছোটকাল থেকেই তো ফুলমন শুধু ব্যথা দিয়েছে কাশেমকে। কাশেম কি চিরদিনই এমনি নীরবে অন্ধকারে একা একা কেঁদেছে? এ কথা তো সে কখনও ভেবে দেখেনি।

কাশেম তাকে ডাকাতি করে এনেছে—এনেছে সহস্র লোকের ভিতর থেকে ছিনিয়ে। এখন দুঃখ দেবে তাকে—দেবে সহস্র আঘাত। কিন্তু কি আশ্চর্য তার বদলে ডাকু কাঁদে। তার ইচ্ছা করে একবার মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে এ কান্নার হেতু কি?

নীরব হয়েছে আঞ্জুর ঘরের ছেলেমেয়েদের গোলমাল—ঘুমিয়ে পড়েছে চরের বাসিন্দারা। কোন কথা নেই, ডাক নেই—না আছে কোন প্রশ্ন! কিন্তু বারবার ফুলমন জিজ্ঞাসা করে তার মনের কাছে—কেন কাঁদে কাশেম?

সে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে দেখে কাশেম তাকে ভালবেসেছে, প্রতিদানে পেয়েছে শুধু অহঙ্কারের তীব্র কশাঘাত। হেতু আর কিছু নয়—তুচ্ছ সামাজিক বৈষম্য। কাশেম ছোট ঘরের ছেলে, আর সে বড় ঘরের মেয়ে। অহঙ্কার-গর্বিতা ফুলমনের মনে যেন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে ওঠে অনুভূতির স্নিগ্ধস্পর্শে। সে মেছো কাশেমের কথা ভুলে যায়। সে তার প্রদীপের আলোতে যাকে দেখে, সে প্রেমিক কাশেম। কালো, তবু কত আলো সে রূপে! সুদৃঢ় গঠন, কিন্তু কত শান্ত চাহনি টানা টানা দুটো চোখে!

আবার একখানা হাত সঞ্চালিত হতে থাকে ফুলমনের সারা দেহে। সে বিদ্যুৎস্পর্শে পদ্মকলি দল মেলে ধীরে ধীরে রাতের আঁধারে।

তবু ফুলমন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ওর মন। মনে পড়ে শৈশবে কেন কৈশোরেও ফুলমন কত ওর কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প করেছে—পৃথক হয়েছে যৌবনে। এই তো সেদিন।

কাশেম একখানা হাত ধরে। ফুলমন শিউরে ওঠে।

'ফুলমন! ফুলমন!'

'কি?'

'কাঁদিস না—কাইল তোরে দিয়া আমু ওপার।'

ফুলমন কোন জবাব দেয় না।

কাশেম সেই হাতখানা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'মাপ কইরা দে আমার গোস্তাকি।' কাশেম যেন কৈশোরের অন্তরঙ্গতায় ফিরে গেছে।

মাপ তো সে অনেক আগেই করেছে, নইলে এত বড় মুখতোড় মেয়ে কি এখন চুপ করে থাকে?

প্রহরে প্রহরে রাত্রি বাড়ে। সে প্রহর ঘোষণা করে আম বাগানের শেয়াল-গুলো। শিশির পড়ে ছনের ছাউনী বেয়ে। বাইরে দিব্যি ফুটফুটে আকাশ। জোৎস্না নেই কিন্তু তারা আছে অজস্র। শরতের শেষ, শীত কেবল পড়ছে। একটু একটু উত্তুরে হাওয়া বইছে। কাঁপছে লম্বা লম্বা কাশ ও ঘাসের গুচ্ছ।

কাশেম ভাল করে একখানা বিছানা বিছায়। 'ফুলমন শীত করে না তোর? এই বিছানায় শো। একেবারে খালি হোগলাডায় পইড়া রইছ।'

ফুলমন উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মোলায়েম লাগে কাঁথা কাপড়গুলো। পরিচ্ছন্ন শয্যা থেকে একটা সুন্দর গন্ধ আসে। সে এতকাল ধরে যা বুঝতে পারেনি, আজ অনায়াসে তা বুঝতে পারে। কেন সে কাশেমকে তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে দিতে চায়নি, কেন রহিমকে বলে ছিল যে কাশেম পারবে না গঞ্জে গিয়ে চাকরি বজায় রাখতে। এমনি করে ক্রমশ ফুলমনের জীবনের সকল 'কেন' প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। কাশেমের ওপর যে তার এত রাগ, এত হিংসা—এর উৎস কোথায় তাও আজ আর ফুলমনের বুঝতে কষ্ট হয় না। সে নিজের মনেই একটু লজ্জা বোধ করে। তলে তলে সেও তো কামনা করেছে কাশেমের সঙ্গ। শুধু স্বীকার করতে পারে নি সজ্ঞানে। এ তার মনের দুর্বলতা বই আর কিছু নয়।

আবার ফুলমনের বিছানার পাশে এসে কাশেম বসে। কোথায় তার পৌরুষ, কোথায় তার ব্যঙ্গ? সে বলে, 'বড় ভুল করছি—এখন দুঃখ হয় আমার, ক্যান্ ভাঙলাম তোর এ বিয়া?'

ভেঙে যা গেছে তার জন্য আপশোষ করার কি আছে ? আড়ম্বর এবং ঐশ্বর্যই কি সব ? এ বিয়ে হয়ত সুখের নাও হতে পারত। একজন অপরিচিত অজ্ঞাতের চেয়ে কি কাশেম মন্দ ? কাশেমের জীবনের সব ছন্দই তো সে জানে। সব গানের সুরেই তো সে সুর মিলিয়ে গাইতে পারবে। তারা একটু বড় লোক —কিন্তু কাশেমই বা কম বড় কিসে ? তার নানার নিরানব্বই কানি জেগেছে, জেগেছে হোগলা হেউলির ছোপা—ধীরে ধীরে ফলে মুকুলে ফসলে ভরে যাবে চরকাশেম। অপরিচিতের অজ্ঞাত ঐশ্বর্যের চেয়ে ভাল নয় কি চিরপরিচিতের চর-ভরা ফসল ?

'জানই তো ফুলমন, ছোট কালে মা মরছে, তার পর মরছে বাপ—তোগো বাড়ি থাইকা কি ভাবে যে দুঃখ কষ্টে মানুষ হইছি, সবই স্বচক্ষে দেখছ। কিন্তু কোন কষ্টরে কষ্ট বাসি নাই, কোন দুঃখুরে দুঃখু ভাবি নাই ক্যাবল তোর মুখ চাইয়া।' কাশেম একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'সেই মানুষটারেই আনলাম জোর কইরা, তার মনে দাগা দিয়া !'

এবার ফুলমন আর জবাব না দিয়ে থাকতে পারে না, 'যদি কই যে আমারে কেও জোর কইরা আনে নাই, আইছি আমি নিজে।'

কিছুকালের জন্য একথা বিশ্বাস করতে পারে না কাশেম। সে অবাক হয়ে থাকে চেয়ে।

এমন সময় ফুলমন ধীরে ধীরে কাশেমের একখানা হাত টেনে এনে তার উত্তপ্ত বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। সে তার শ্লথ তনু আর একটু এগিয়ে নিয়ে আসে কাশেমের কাছে। লজ্জার মাথা খেয়ে মুখে কিছু বলতে পারে না ফুলমন। ভেবেছিল কত কৌশল, কত চতুরতা করবে। তার মনে হতে থাকে কাশেম যেন এক দুগ্ধপোষ্য বালক—আত্মসমর্পণ করেছে স্নেহময়ী নারীর কাছে—চাইছে সস্নেহ মার্জনা।

সে একটু একটু করে উত্তপ্ত বুকে টেনে নেয় অনুতপ্ত কাশেমকে।

তার নরম গাল দুখানা বারবার বুলায় কাশেমের শক্ত গালে। অবশেষে নিবিড় বিহ্বল চুম্বনে পাগল করে দেয় কাশেমকে।

তারপর এক সময় কাশেম তাকে জড়িয়ে ধরে অন্ধ আবেগে। অন্ধকারের আশীর্বাদে সমস্ত ভুলভ্রান্তি ঘুচে, মুছে যায় বৈষম্য ও দৈন্য।

দেখতে দেখতে রাতটা পরস্পরের তপ্ত সান্নিধ্যে কেটে যায়—

পরদিন অতি প্রত্যুষে আঞ্জু লক্ষ্য করে যে চরকাশেমের খালের ঘাটে ফুলমন হোগলা মাদুর ধুয়ে স্নান করে আসছে।

একটু বেলায় আঞ্জু তার কাছে এলে এমন সলজ্জ হাসি ফুলমন হাসে, যে হাসি স্ত্রীলোক জীবনে শুধু একবারই হাসতে পারে।

'বড় যে খোস মেজাজ দেখি?'

সে কথার জবাব না দিয়ে ফুলমন বলে, 'একটু ভাল মাটি দিতে পারো আঞ্জু? চুলা পাতুম।'

'পারুম না ক্যান? চরে আমাগো মাটির অভাব?'

আঞ্জু মাটি এনে দেয়—উনান গড়ে ফুলমন। গৃহস্থের মেয়ে না জানে কি!

ঘুম থেকে উঠে কাশেম সব লক্ষ্য করে একটু তৃপ্তির হাসি হাসে। সে হাঁড়ি পাতিল চালনুনের জোগাড়ে যায়।

'একটু তাড়াতাড়ি আইসো।'

'ক্যান? কোন কাম আছে নাকি? কও - কইরা দিয়া যাই।'

'না। কাইল তো কিছু খাও নাই।'

কাশেম মনের আনন্দে হেঁটে চলে। এর মধ্যেই ফুলমন ফুল ফোটাতে শুরু করল চরকাশেমে! সে শুধু সুন্দরী নয়, মমতাময়ী। এ-রূপ ওর এতদিন কোথায় লুকান ছিল? আবার এত আকস্মিকভাবে কি করে টলমল করে উঠল রাঙা পদ্মের মত? তবে আর ভাবনা নেই কাশেমের।

নানা কাজে কাশেমের গঞ্জ থেকে ফিরতে একটু দেরি হওয়ার কথা। তাই সে চাল ডাল হাঁড়ি পাতিল বাড়ি পাঠিয়ে দেয় হাফেজের মারফতে। খুব ভাল দেখে শাড়িও কিনে দেয় একখানা। শাড়ির রঙেই চোখ ধাঁধাঁয়।

ফুলমন খুশী হয়। সে শাড়িখানা না পরে থাকতে পারে না। ঐ শাড়ি পরেই রান্নাবান্নার কাজ সারে। বেলা বেশ হয়েছে, তবু কাশেম আসে না। ফুলমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা দৌড়াদৌড়ি চেঁচামেচি শোনা যায়—পুলিশ, পুলিশ!

ফুলমনের হাতে কাদা, কি যেন করছিল—সে কতকটা বিস্মিত হয়ে যায়। নিমেষে বিভ্রান্তি নেমে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট একটা পাল্কী বোরখা ও পর্দা নিয়ে হাজির হয় ফুলমনের চাচা। বাড়িতে যতটা থাক বা না থাক তার চেয়ে অনেক বেশি আব্রুর ঢক্কা বাইরে।

'মিঞা ভাই মারা গেছে তোর শোকে। একি! তোর হাতে কাদা ক্যান্? তোর পরণে যে পাটের শাড়ি?'

পঞ্চাইতের কথায় হঠাৎ ফুলমনের মনটা ঘুরে যায়। সে কেঁদে ফেলে।

'ডাকাইতরা আমারে বাঁদী কইরা রাখছে…ও বাজানগো……চাচা আমারে বাড়ি নিয়া চলো।'

'কান্দিস না,—কান্দিস না—হাত ধোও, বোরখা পর'

বোরখা প'রে ফুলমন পাল্কীতে ওঠে—পর্দা ধরে আটজন বেহারা! সে কাঁদতে কাঁদতে পঞ্চাইতের নায়ে গিয়ে ওঠে।

নদীর এপারে একটা এলাকা ওপারে আর একটা। দু এলাকার পুলিশ একত্র হয়ে সকলকে বাঁধে। চরকাশেমের একটি বাসিন্দাও বাকি থাকে না। কাশেম দুর্ভাগ্যক্রমে এসে পড়েছিল গঞ্জের কাজ সেরে। সেও ধরা পড়ে। নিরীহ রসময় তো আগেই ধরা পড়েছে। কেঁদে-কেটে ফুলমন স্থির হয়।

তাকে জবানবন্দী দিতে হবে একটু বাদে। এখন তার ওড়না ও শাড়ির জন্য তল্লাসী চলছে ঘরে ঘরে। পঞ্চাইত তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে সনাক্তদার হয়ে। যে ঘরে পুলিস ঢোকে, ওড়নার বদলে কান্না শোনা যায় স্ত্রীলোকের। ধান চাল একাকার।

দুপুর বেলার চড়া রোদ। তখন পর্যন্ত খাওয়া হয়নি কারুর। কাশেম তো দুদিনের উপবাসী। আবার এসেছে নানা স্থান ঘুরে টাকা পয়সার ফিল-ফাজিল ভেঙে। রসময় বৃদ্ধ। ছাগলের পালের মত বাঁধা লোকগুলোর ভিতর ওরাই যেন দুজনে ক্লান্তিতে বেশি ভেঙে পড়েছে।

ফুলমনের নায়ের জানালা দিয়ে সব দেখা যায়। বড় দারোগা আসেন তার খোপে।

'বলো তো মা ঘটনা কি ঘটেছিল তোমার বিয়ের রাতে?'

'ওই তো ওরা ঐ কাশেম রহিম রসময়…।'—পঞ্চাইত জোগান দেয় কথা।

চুপ করুন, পঞ্চাইত সাহেব, ওঁকে বলতে দিন।'

'কি হয়েছিল মা? কাকে কাকে তুমি দেখেছ? দেখো তো চিনতে পার কি না?'

কোন জবাব দেয় না ফুলমন। লজ্জায় মুখ বার করে কারুর দিকে তাকাতে পারে না সে।

'এমন করলে তো তোমাদেরই ক্ষতি। দুষ্ট দুষমনের বিচার হবে না। মুসলমান মেয়েরা ভারী লাজুক।'

একটু জল খেতে চায় কাশেম। পাহারাওয়ালা ধাক্কা মারে। 'চুপ শালা।'

পরিশ্রান্ত কাশেম ধাক্কা সামলাতে পারে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দড়িতে টান লেগে রসময়ও ওর পায়ের ওপর গড়িয়ে টাল সামলে নেয়।

নায়ের খোলা জানালা দিয়ে ফুলমন সবই দেখতে পায়। কাশেম ও রসময় হাঁপাচ্ছে।

পঞ্চাইত জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে চুপ কইরা থাকবি নাকি, কিছু কবি না?'

'ক্যান কমু না চাচা? এই তো কই।' ফুলমন একটা ঢোক গিলে বলে, 'দারোগা বাবু আপনে বাপের তুল্য—আপনার কাছে যা কই তা সত্য। আমি নিজের ইচ্ছায় আইছি—আবার যখন খুশি হইবে নিজের ইচ্ছায়ই বাড়ি যামু।'

দারোগা বারবার জেরা করে, ফুলমন দৃঢ় হয়ে থাকে।

'কি পঞ্চাইত সাহেব? আপনাদের মেয়ে তো সাবালিকা। আমি কি করব?'

পঞ্চাইত থ' মেরে থাকে।

'তবে নৌকা খুলি?'

'আপনার মর্জি।'

'তেওয়ারী ওদের ছেড়ে দাও।' দারোগা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, 'শুধু পুলিসের দুর্নাম। আমি তো অনেক আগেই এ সব জানি। বয়স্থা মেয়ে ইচ্ছা না থাকলে কি জোর করে আনা যায়!'

১৬

পিতার মৃত্যুতে অধীর হয়ে পড়েছিল ফুলমন। সে বুঝে দেখে যে এখন শোক করা চলবে না। তাদের সম্পত্তি টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। কথায় বলে মুসলমান মহলে নাকি বাড়ির বড় মোরগটাও একটা অংশ পায়। তবু ফুলমন এবং তার মা-ই বড় অংশীদার। পঞ্চাইত চাইবে তাদের হাত করতে। মা অপেক্ষা করে থাকবে মেয়ের আশায়। কাশেমকে জামাই করায় এখন তার সুবিধাই বেশি। পঞ্চাইতকে জব্দ করতে হলে এখন যথেষ্ট জনবলের প্রয়োজন। মায়ের নিশ্চয় পছন্দ হবে কাশেমকে, আর মেয়ের তো হয়েছে আগেই।

একটি রাত্রির সহবাসে, একটি রাত্রির সোহাগে সম্ভোগে কি যে বশীকরণ মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে ঐ যোয়ান কাশেম তা ফুলমন ভাবতেও পারে না! এত সুখও দুনিয়ায় আছে, এত শান্তিও লুকান থাকে পুরুষের হিম্মতে!

কাশেমের খানাপিনা হয়ে গেছে। ফুলমন সকল কথা ভুলে তার সংসার গুছায় আর বার বার অনুভব করে—গত রাত্রির মর্মান্তিক পীড়ন। সে যেন বেহেস্তে গিয়েছিল গত নিশায়। তার স্তনবৃন্তে, কপোলে, গুরুভার উরু সন্ধিতে এখনও যেন জড়িয়ে আছে সে মহা পীড়ন!

ফুলমন সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার শয্যা বিছায়। আলো জ্বালায়—প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

এমনি করে কিছু দিন কাটে ফুলমনের। কাটে মত্ত হাতীর পাগলা নেশায়।

কিন্তু একদিন আঞ্জু ফুলমনকে ক্ষেপিয়ে তোলে। 'কিলো, মাছের গোন্দ লাগে ক্যামন? জাউলার গায়ের ঘসা? বড় যে ডুইবা গেছ আমোদে? একবারও দেখি যাও না আমাগো বাড়ি?'

'মুখ সামলাইয়া কথা ক ছোট লোকের ঝি।'

আঞ্জু এসেছিল রহস্য করতে কিন্তু রহস্যের পরিণতি যে এমন ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে তা সে কল্পনা করেনি। তার মুখ থেকেও যা প্রথম বেরিয়েছে তা উপভোগ করার মত নয়—হয়েছে শ্লেষোক্তি।

'ওরে আমার বাদশাজাদী, তোর সাথেও কথা কমু মুখ সামলাইয়া? তোর কাশমারেও ডরাই নাকি আমি?'

'কি কইলি, কাশমা!' ফুলমন আশ্চর্য হয়ে যায়।

'হয়, হয়—কাশমা, হাসমার পো কাশমা। আমার আঠু (হাঁটু) কাপে না ডরে। আমি কত দেখছি অমন মাইগ্যা পুরুষ।'

ফুলমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে মুখরা বটে কিন্তু আঞ্জুর সঙ্গে জবাব দিয়ে এঁটে উঠবে এমন মেয়ে নয়। বড় ঘরের মেয়ে হয়ে সে শুধু শাসিয়ে বেড়িয়েছে সকলকে। কেউ তো তার প্রতিবাদী হতে সাহস পায় নি। এখানে সে যার জোরে জোর করবে তাকেই তো গ্রাহ্য করে না এই সামান্য আঞ্জু।

খেদে ক্রোধে ফুলমনের বুকটা ফেটে যেতে চায়। আঞ্জুই এসে বিশ্রী ঠাট্টা জুড়ে দিল, আবার তার কথারই ধার বেশি! সে এ সমাজে কি করে থাকবে? কেমন করে দিন কাটবে এমন মর্যাদাহীন কাশেমকে নিয়ে? নিত্য দু বেলা সে

কি ঝগড়া করতে নামবে ? সে একটু বদরাগী, খানিকটা খামখেয়ালীও বটে। তা সে নিজেও যে না জানে তা নয়। তবে অভদ্র নয় সে। বচসা করতে হলেও সে কিছুতেই নেমে যেতে পারে না একেবারে নীচু ধাপে। আঞ্জুরা সামান্য নিয়ে যা সমারোহ করতে পারে, তা ওর কাছে অসম্ভব। এখানে থাকতে হলে রীতিমত গলায় শান দিয়ে রাখতে হবে। একটুতেই প্রয়োগ করতে হবে সেই ক্ষুরধার ছুরি।

আঞ্জু কখন চলে গেছে তা দেখেনি ফুলমন। সে ঠায় বসে থাকে পৈঠায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তবু তার ইচ্ছা করে না বাতি জ্বালতে।

সেদিন সে কি অন্যায়ই না করেছে চাচার সঙ্গে না গিয়ে। এমন কদর্য আবেষ্টনের মধ্যে সে নিজেকে ইচ্ছা করেই সমর্পণ করেছে। তার পিতা মাতা ও বংশের আভিজাত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা আসে তার মনে। সে সবের তুলনায় এরা কত নিকৃষ্ট ! কত ঘৃণ্য এদের চাল চলন !

কাশেম বাড়ি ঢুকেই বুঝতে পারে যে একটা কিছু হয়েছে। তবে সে অনুমান করতে পারে না যে কেন এবং কি কারণে আঞ্জু এসে খোঁচা দিয়ে গেছে ফুলমনকে ! এতটা যে গড়াবে আঞ্জুও হয় তো বোঝে নি।

'আন্ধারে যে ?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফুলমন উঠে গিয়ে প্রদীপ জ্বালায়।

'কি হইছে ?'

ফুলমন দুঃখে ঘৃণায় জবাব দিতে পারে না।

'বড় যে গোসা গোসা ঠেকে ?'

এবার ফুলমন খাওয়া দাওয়ার সমস্ত সামগ্রী এগিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। রান্না সে দিন থাকতেই সেরেছে। হাত পা ধুয়ে কাশেম তার নিকটে এসে বসে, 'হইছে কি ফুলমন ?'

'আমি কাইল ওপার যামু।'

'ক্যান্ ? কেও কইছে নাকি কিছু ?'

ফুলমনের ইচ্ছা করে না যে আঞ্জুর কথা উত্থাপন করে, আবার সহস্রটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। সে শুধু বলে, 'না।'

'তবে ?'

'আমার মন ভাল লাগে না।'

'তয় যাইও—পরান ঠাণ্ডা হইলে আবার আইসো।'

'আমি আর আমু না চরকাশেমে।'

এতদিনে কাশেমও বুঝেছে, তর্ক এবং জোর করে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বশ্যতা স্বীকার না করলে কিছু সুখের হয় না। তাই সে বলে, 'ভাল না লাগলে আইও না—করুম কি আমি!'

প্রদীপটা নিবে আসছে, তেল ঢেলে উসখে দেয় কাশেম। 'খাবা না? যাবা তো কাইল—উপাস থাকবা কি দোষে?'

ফুলমনের কাজ কাশেম করে, দুজনের ভাত বাড়ে—ছালুন নেয় পাতে। কাঁচের একটা গ্লাস—সেই গ্লাসটায় জল ঢেলে ফুলমনের থালাখানার পাশে রাখে। সে জানে যে গ্লাস না হলে ফুলমনের অসুবিধা হয় খুবই। কাশেম পারে খাওয়া শেষ হলেও মুখ ধুয়ে জল খেতে। অভ্যাস আছে সবই। ফুলমনকে সেধে এনে পাতের কাছে বসায় কাশেম। 'ঘরের বৌ উপাস কইরা গেলে বড় দোষ। শুধাশুধি কেন হবা বদের ভাগী? আমি দুঃখ পাইলে দূরে গেলেও বুক পোড়বে। করছ তো কয়দিন সোংসারী।'

অভিমানিনী ফুলমন খেতে খেতে কাঁদে। কাশেম তাকে অনেক প্রবোধ দেয়। ফুলমনেরও মনে পড়ে ওপারের অসুবিধার কথা। পিতার মৃত্যুতে তাদের সংসার শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আর লাভ নেই সেখানে গিয়ে। তাকে এখানেই থাকতে হবে। শিখিয়ে বুঝিয়ে নিতে হবে এই কাশেমকে। আঞ্জুর সে তোয়াক্কা কি রাখে? তারই তো চরকাশেম। সে কি পোড়ারমুখী আঞ্জুর কথায় ফেলে যাবে সব? ঠেলে যাবে পা দিয়ে এত বড় একটা চরের ঐশ্বর্য? আঞ্জু হয়ত তাই চায়। কিন্তু ফুলমন এমন বোকা নয়। সে ফেলেও যাবে না, ঠেলেও যাবে না, খোদা যা তার নসিবে জুটিয়েছে। মন্দ কি কাশেম? মন্দ নয় তো তার উদ্দাম ভালবাসা।

গভীর রাত্রে কাশেম ফের জিজ্ঞাসা করে, 'যাবা নাকি কাইল?'

'না গো, না।'

উত্তর শুনে কাশেম আবার তাকে আনন্দে বুকে চেপে ধরে নিবিড়ভাবে।

সে নিপুন হাতে ফের তার সংসার গুছিয়ে নিতে আরম্ভ করে। তবু ঠিক যেমনটি প্রয়োজন, তেমনটি করতে পারছে না পয়সার অভাবে। ক্রমে ক্রমে সে জানতে পারে যে কাশেম আর মাছ ধরতে যায় না তার ভয়ে। কেবল ধার কর্জ করে সংসার চালায়। এ তো মোটেই ভাল নয়। এমন ধার কর্জ করে সংসার চালানো মানে দেনার দায়ে চরকাশেম খোয়ানো। না, ফুলমন চরকাশেমের

এক কানি জমিও নষ্ট হতে দেবে না। তার সুখ শান্তি মান সম্মান সব কিছু নির্ভর করছে এই চরকে কেন্দ্র করে।

কেমন যেন একটা মায়াও হয়েছে ফুলমনের। সে যখন চেয়ে দেখে আম বাগানের পুব দিয়ে একটি মাত্র অগভীর খালের ব্যবধান রেখে ধীরে ধীরে নেমে গেছে এই বালুরচর ঢালু হয়ে নদীর কোল পর্যন্ত তখন মনে হয় কত বড় এই চর! কে বলে মাত্র নিরানব্বই কানি? সে এই চরে শুধু তো গ্রাম নয়, গঞ্জ গড়ে তুলবে। ফসল যতদিনে না ফলবে, আসল সে কিছুতেই খেতে দেবে না। সে মেছো মেছোনীর হাট বসাবে। বাদশা করবে কাশেমকে। শুধু সোহাগ সম্ভোগে নয়—চরকাশেমের ঐশ্বর্য নিঙ্‌ড়ে মণিহার গড়িয়ে দেবে কাশেমের গলায়। যদি সে ঐশ্বর্য জলে থাকে তাকে কূলে তুলতে হবে। তুচ্ছ করলে তো চলবে না। এতদিনে ওপারে তার মেছোনী খ্যাতি হয়েছে। সে তো খ্যাতি নয়, অখ্যাতি। সে অখ্যাতি ফুলমন ঢাকবে রূপোর দশটা হাঁসুলি, পাঁচজোড়া বাজু, হরেক রকম গয়না গড়িয়ে। সে একদিন কাশেমকে নিয়ে কোষ নায়ে চড়ে ওপারে যাবে—নিত্য নতুন গয়না পরে তাজ্জব লাগিয়ে দিয়ে আসবে চাচা চাচিকে। সেদিন সবাই বুঝবে মেছোনীর কি মহিমা!

ফুলমন আজই বলবে কাশেমকে মাছ ধরতে যেতে। কিন্তু একটা মুস্কিল। বিয়ের পরে যে স্বামীকে আপনি বলার একটা দেশি রেওয়াজ আছে তা ফুলমন বদলে দিতে চায়। তাদের বিয়ে যেমন বাপ মায়ের বা কোন অভিভাবকের ইচ্ছা কিংবা মতের অপেক্ষা রাখেনি, তেমনি ডাকটাও হবে খেয়াল খুশির ডাক। এতদিন ধরে সে মাঝামাঝি একটা কিছু বলে কাজ চালিয়েছে। কিন্তু আজ বদলাবে। বলবে 'তুমি' 'তুমি'। যদি কাশেম অসন্তুষ্ট হয় তখন না হয় বোঝা যাবে।

কাশেম বরঞ্চ খুশীই হয়। খোস মেজাজে জবাব দেয়, 'কিগো ফুলপৈরী?'

সে আবেগে ভরপুর। সে এখন সম্পূর্ণ বিজয়ী। ফুলমনকে ছেড়ে তার এক মুহূর্তও এদিক ওদিক যেতে ইচ্ছা করে না। পাহারা দিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে সাপের মাথার মণির মত। কত কষ্ট করে সে আহরণ করে এনেছে। কত আসমান-জমিন ঢেউ ঠেলে।

দিন যায়।

ক্রমে ক্রমে মাসও প্রায় কাটে। সংসার নতুন হলেও তার একটা ব্যয় আছে। ফুলমনের গায়ে যাতে দুঃখের বাতাস না লাগে তার জন্য অন্যের চাইতে

অনেক বেশি খরচ করতে হয় কাশেমকে। তাকে কষ্ট দেওয়া মানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা। কোন পুরুষই জ্ঞান থাকতে তা নববধূকে জানতে দিতে রাজী নয়। বিশেষত ফুলমনের মত মেয়েকে।

তাই সময় সময় তার চোখের রং মিলিয়ে যায়, নেশার আমেজ কমে আসে। অর্থের চিন্তায় তাকে অস্থির করে তোলে। কেউ তো জানে না, সে কয়েকবার টাকা ধার করে এনেছে গঞ্জে গিয়ে প্রমিলার কাছ থেকে। এমন করে আর কতদিন চলতে পারে। নিজের একটা ধরা-বাঁধা আয় না থাকলে পরের সাহায্য কিছু নয়।

এর ওপর আবার হঠাৎ মেঘ জমল। আকাশে মেঘ জমলে অতটা ভয় পেত না জেলের ছেলে। মেঘ দেখল ঘরে। ফুলমনের মুখখানা কদিন ধরে কেন জানি ভার ভার। যে খামখেয়ালী মেয়ে ফুলমন। কখন পান থেকে চুন খসল তা বোঝাই দায়! জেলের মগজে অন্তত সে বুদ্ধি নেই। ওকে নিয়ে সংসার করা যে-সে কথা নয়! কাশেম ভয়ে ভয়ে চলে।

এই রোদ, এই মেঘ—আলোছায়ার এক অদ্ভুত খেলা। এ রহস্য বুঝে বুঝে পা ফেলা বড় সুকঠিন। কি হল আবার ওর? কাশেম জিজ্ঞাস করবে কিন্তু ভরসা পায় না।

'হাওলাদার।'

চমকে ওঠে কাশেম। তবু জবাব না দিয়ে কি উপায় আছে! 'কি?'

'মাছ ধরতে যাও না ক্যান?'

যাক তবু ভাল। 'এই যাই না, যাই না—তুমি তো মাছের গোন্ধ সইতে পার না। তাই, বোঝলা নি···?'

'সেদিন আর নাই হাওলাদার।' নির্লজ্জা আঞ্জু এসে দুয়ারে দাঁড়াল। ঝগড়া তর্কের কথা যেন বেমালুম ভুলে গেছে, বলে, 'দুই আঙ্গুল তেল ধার দিতে পার না কি ফুলমন? বড় অসময়ে আইছি—না?'

আঞ্জু চেয়ে দেখে যে তার ঘরে তেল বাড়ন্ত আর ফুলমনের ঘরে তেল অফুরন্ত। টাটকা নারকেল তেলই দু শিশি। কটু তেল আছে বড় বোতলের এক বোতল। কাশেম খাটে না তবু জোটায় কি করে? আগের জমান টাকা হয়ত ভাঙে, যা গোপন করে রাখা হয়েছিল এতদিন।

'একটু নারকেল তেল দেও না, মাথাডা আমার রুখা (রুক্ষ)।'

ফুলমন কি আর বলবে, একটা শিশি নামিয়ে আনে। শত হলেও চর

কাশেমের সে নতুন বৌ, তাকে বলতে হয় ভদ্রতার খাতিরে, 'হাতে দিমু কি, বসো মাথায় দিয়া দিই।'

ফুলমনের কথামত আঙ্গু বসে। তার মাথায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত তেল দিয়ে দেয় ফুলমন। আঙ্গুর সুদীর্ঘ চুলের গুচ্ছও আঁচড়ে দিতে হয় পরিপাটি করে। ওদিকে আঙ্গুর উনানে ডাল পোড়া লাগে তবু সে উঠতে চায় না।

চুল আঁচড়ান সারা হলে এত যত্ন করে যে প্রসাধন করে দিল, তার কাছে বিদায় না নিয়ে আঙ্গু বিদায় নেয় কাশেমের কাছে। 'চলি হাওলাদার।' কটাক্ষে বিদ্যুৎ খেলে তার।

নরম গলায় কাশেম বলে, 'আইসো গিয়া—যাওন নাই।'

ফুলমন সমস্তই লক্ষ্য করে। সে ভাবে চিরদিনই মেছোর ঝোঁক মেছোনীর দিকে। সে মন্তব্য করে, 'স্বভাব যায় না মৈলে, ইজ্জৎ যায় না ধুইলে।'

'ও কথা কইলা ক্যান ফুলপৈরী?'

'তয় কি খ্যাংরা মারুম বেইমাননীর কপালে? এই ছোটলোকের মেলে আমার থাকা হইবে না। আমার নসিবে যে খোদা কি লেখছে।'

কাশেম চুপ করে থাকে।

চরের সকলেই বঁড়শি নিয়ে এখন নদীতে যায়। যা পায় তা দিয়ে টানাটানি করে সংসার চালায়। কিন্তু চলে না একটি পয়সাও বাজে কাজে ব্যয় করা। আর বাজেই বা বলা যায় কি করে? কেউ চায় একটু কোরানসরিফ পড়াতে। কেউ বা চায় হাওলাদার ও ফুলমনকে একটু নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। কারুর বা ইচ্ছা করে দুদিন ঘুরে একটু যাত্রা বা জারী গান শুনে আসে নিকটের গঞ্জ থেকে। আর কাঁহাতক ভাল লাগে গাধার মত খাটতে! কিন্তু বুড়ো কৈবর্ত রজনী আত্মতুষ্ট। সে সন্ধ্যাবেলা একা একা খঞ্জনী বাজিয়ে গান গায়, একা একাই তা শোনে। গুরুর নাম করতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

কোথায় যেন একবেলার জন্য গিয়েছিল কাশেম। তার মনে ফুলমনের জন্য চিন্তা। বাঁকা মন্তব্য করেছে, আবার সত্যি সত্যি না বেঁকে দাঁড়ায়। বড়-লোকের মেয়ের মনের হদিস পাওয়া মেছোর কর্ম নয়। সেদিন সে এমন কি বলেছিল আঙ্গুকে? শুধু নরম সুরে একটু বিদায় দিয়েছিল। কাশেমের জন্য আঙ্গু অনেক করেছে, এখনও করতে পারে—তার কি কোন প্রতিদান কিংবা

প্রত্যাশা নেই ? সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখে যে ফুলমন একটা আশ্চর্য কাজ করেছে। একখানা পুরান ইলশা জাল ছিল, যা ডোঙা নায়ে একা একা বাওয়া যায়। তা নিপুণ ভাবে মেরামত করে গাব দিয়েছে। এখন টনটন করছে জাল। জলের মধ্যে সরসর করে চলবে।

হাওলাদার প্রশ্ন করে, 'কে শিখাইল ফাস গড়া ? একেবারে টুকরা টুকরা হইছিল ! আমি থুইছি ত্যাগ কইরা।'

'শিখছি ঐ বাড়ির বৌর কাছে। দেখো তো পারছি কিনা মাইলা মিলাইয়া লায় লায় (ক্রমশ) ছোট করতে ?'

'চোমৎকার পারছ !'

জাল ছেড়ে জেলেনীর গাল দুটো টিপে দেয় কাশেম।

'ধ্যেৎ, কামের সময় যত আকাম।'

সেদিন আঞ্জু চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ জ্বলেছিল ফুলমন। তার আভিজাত্যের মিনার আবার টলমল করে উঠেছিল। এক রকম সে মনে মনে স্থিরও করে ফেলেছিল এই সংসর্গ ত্যাগ করবে বলে।

কিন্তু হাওলা বেড়ার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ তার নজর পড়ল পাশের বাড়ির দিকে। স্বামী স্ত্রীতে গান গাইছে আর জাল বুনছে :—

ধৈরয না মানে কন্যা
ধৈরয না মানে
জাঙাল ভাইঙা চলে কন্যা
বঁধুর সন্ধানে…
(ওরে পরাণ বন্ধুরে, এট্টু খাড়াও না…)
রাঙা শাপলায় দেখে কন্যা
বন্ধুর রাঙা মুখ…

হঠাৎ যুবতী স্ত্রী থামে। কবিয়ালের পদ বদলে নিজের ইচ্ছামত একটি পদ জুড়ে দেয় সুর করে :—

তোমার মুখখান বুকে রাখলে বন্ধু
হয় ক্যাবল সে সুখ।…
(ওরে পরাণ বন্ধুরে এট্টু খাড়াও না…)

থুতনিটা একটু নেড়ে দেয় স্ত্রী। স্বামী আর অপেক্ষা করতে পারে না। তখনি সে সবিক্রমে জবাব দেয়। হয়ত আরো দিত—

একটি ছোট ছেলে দাওয়ায় খেলছিল—সে এসে মার সপক্ষে দুটি কচি দুধে দাঁতে হাসির হীরা মেখে দাঁড়ায়। জড়িয়ে ধরে মাকে। হাততালি দেয় নেচে নেচে।

মা কোলে তুলে নেয় জাল বোনা ছেড়ে। বালককে সোহাগ করে আর বলে, 'ও আমার বাবা লক্ষীন্দর, তুমি বাচাইলা আমারে ডাকাইতের হাত থিকা।'

ফুলমন নিজের ঘরে চলে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবে তারপর জাল নিয়ে বসে। সে তো জাল সারতে কি বুনতে জানে না। ও বাড়ির বৌকে ডাকে একটি ছোট ছেলে পাঠিয়ে।

কি যেন ছুতা করে আঙ্গু আবার এসেছিল ছায়া মূর্তির মত। সে লজ্জা না পেয়ে বরঞ্চ সাগ্রহে উপভোগ করে কাশেম ও ফুলমনের রঙ্গালাপ? সে কিছু না বলে আবার ছায়া মূর্তির মতই সরে যায়। হঠাৎ সে ভাবে ওদের দুজনকে কি বিষ খাওয়ান যায় না—উগ্র কেউটে সাপের বিষ? দুজনাকে নয়। এক-জনকে—ঐ সর্বনাশী ফুলমনকে। ও কোন্ অধিকারে উড়ে এসে জুড়ে বসল চরকাশেমে?

বর্ষার দেরি আছে। তবু ফুলমন জোর করে কাশেমকে নদীতে পাঠায়।

'অকালে যামু জাল লইয়া ইলশা ধরতে?'

'যাও না। মাছ চলে বারমাস নদীতে। বাজান এইকালে কত মাছ কিইনা আনছে দক্ষিণ থিকা।'

অনেকে ঠাট্টা করে। কাশেমও যায় লজ্জায় একা একখানা নায়ে।

কোথায় ফেলবে জাল? চরকাশেমের বাসিন্দারা হয়ত দেখে ফেলবে কাশেমকে। সে নদীর সোজা বাঁকে জাল না ফেলে একটা কনুই ভাঙা মোড়ে জাল ফেলে। সেই মোড় ঘুরে নদীর জল একটা পাক খেয়ে সোজা দক্ষিণে নেমে গেছে। কাশেম দড়ি ছাড়ে ইচ্ছা মত, নদীর বুক ঠেকিয়ে। ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে দক্ষিণে নেমে আসে জাল। একটা দুটো অনেকগুলো টান পড়ে হাতের সুতোয়। কাশেম তাড়াতাড়ি জালের মুখ বন্ধ করে উপরে টেনে তুলতে চেষ্টা করে। জল তো একটু নয়। কিন্তু জাল যে তোলা যায় না। হাতের দড়ি ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার জোগাড়। কুমীর পড়ল নাকি? না, না। কাশেম সুতোয় এবং দড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে একটা

কিছু ঠিক করতে চেষ্টা করে। কুমীর হলে কি ঐ পাতলা জালে এতক্ষণ বন্দী থাকতে পারে? ইলিশ মাছও তো নয়। ওঠে প্রায় শ'খানেক একহাত দেড়-হাত শিলন। ঝাঁক সমেত ঢুকে পড়েছিল জালে। জাল তুলে কাশেম আর দেরি করে না। সোজা চলে আসে চরের দিকে।

একেই বলে ভাগ্য। শিলনের ঝাঁকের সঙ্গে পোনাও উঠেছে দুটো ইলিশও দেখা যাচ্ছে।

চরের পাকা জেলেরা বলে, এসব নতুন কিছু নয়। দক্ষিণের লোকেরা এমনি ঘোপে ঘাপে ছোট ফাঁসের ইলশা জাল বায়, মাছ ওঠে সব রকম। আগে যারা ঠাট্টা করেছে তারা হয়ত এসব জানে না।

এসব দেখে জাল তৈরির ইচ্ছা হয় সকলের। এবং দুরাতের মধ্যে প্রত্যেকে এক এক খানা করে জাল বুনে শেষ করে। স্বামী স্ত্রীতে কিংবা অন্য কেউ দুদিক দিয়ে জিদ করে কাজে লাগলে আর কতক্ষণ একখানা জাল বুনতে!

এরপর একদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে হয়ে যায় কাশেম ও ফুলমনের। কাশেম ভেবেছিল একটু আড়ম্বর করে খাওয়াবে। কিন্তু হিসাবী ফুলমন তা বাতিল করে দেয়। দাওয়াত করার সময় ঢের আছে। তার আগে ঘরখানা তোলা উচিত টিন কিনে।

সারি সারি ডোঙা আসা-যাওয়া করে চরকাশেমের খাল দিয়ে। সারি সারি জেলের নাও। নতুন জালে মাছও কিছুদিন পাওয়া যায় প্রচুর। কিন্তু শীত কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসে দক্ষিণে হাওয়া। ক্ষেপে উঠে নদী। দেখতে দেখতে ছোট ছোট ঘোলাগুলো মূর্তি ধরে সেই রূপকথার রাক্ষসীর। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়।

চিন্তা হয় চরকাশেমের বাসিন্দাদের। এখন আবার কি করা যায়? দিন দিন নদীর সঙ্গে তাল রেখে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা সহজ কথা নয়। যেমন যেমন নদীর মূর্তি বদলাবে তেমন তেমন ওদের পেশারও রকমফের করে চলতে হবে। কোনো কালে নির্দিষ্ট একটা কিছুকে আশ্রয় করে স্থির থাকা যাবে না। শুধু বন্যা, তুফান, ঝঞ্ঝা কিংবা শীতের হিমেল হাওয়া অথবা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের চামড়া পোড়ান রোদ আসল কথা নয়, আসল কথা তহবিলের অভাব। ব্যবসা করতে হলে চাই কিছু নগদ টাকা।

রসময় বলে, 'চিন্তা নেই তোদের।' টাকার কোনই সংস্থান নেই, তবু রসময়ের এ আশ্বাসের মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই—আছে পরম নির্ভরশীল একটা

ভরসা, যে ভরসার দীপ্তি ও আলোক শুধু ওর মত বিশ্বাসী লোকই দেখতে পায়। চিরদিন আশার আলো জ্বালিয়ে চলে হতাশ ক্ষুধিতের বুকে।

প্রকৃতি কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। কোন শোক দুঃখ তার গতি রোধ করতে পারে না। নদীর বুকে সাদা বকের পালকের মত শীতের মেঘ তার রং বদলায় চৈত্রের দক্ষিণা হাওয়ায়। প্রথম দেখায় পাতলা ধোঁয়াটে মলিন—তার-পর আসে কালো হয়ে। ধেয়ে চলে চরকাশেমের নদী ও ছোট বড় গাছপালার ওপর দিয়ে। সময় সময় আকাশটা যে নীল ছিল তা আর বুঝতে পারে না কেউ। আঁধার হয়ে থাকে জলো মৌসুমি মেঘে। কোন কোন দিন যুদ্ধ চলে উত্তরে ও দক্ষিণে হাওয়ায়। নদীর বুকে ওঠে বেসামাল মাথাভাঙা ঢেউ, যেন পাগলা হাতী মেতেছে জলের বুকে। একটার গায় আছড়ে পড়ে আর একটা। ভেঙে চুরমার হয়ে ফেনায় ফেনায় একাকার করে দেয় চারদিক। চরের জেলেরা আর বড় নদীতে নৌকা বার করে না। খালের কোলে চুপ করে বসে থাকে বড় বড় হোগলা ছোপার অন্তরালে। চোখে শুধু দেখা যায় যেন জলের কুজ্ঝটিকা, কানে আসে শুধু প্রলয় মাতন। বাড়ি ফিরে যায় জাল ও বঁড়শি গুটিয়ে। মেয়েদের হয় মহা ভাবনা। হাঁড়ি চড়াবে কি করে? কিন্তু ঈশ্বরের কি ইচ্ছা! হাঁড়ি চড়ে সকলেরই, যার আছে সে ধার দেয়। যার নেই, সে চেয়ে নেয়। এর জন্য কেউ রুষ্ট হয় না, কেউ করে না লজ্জা বোধ।

এমনি করে ওরা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে, প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধি করে নয়—যুদ্ধ করে।

কখনও হাওয়া নেই, মেঘ নেই, কড়া রোদে শুকিয়ে যাচ্ছে পিটের চামড়া। ওরা জাল কিংবা বঁড়শি বেয়ে বাড়ি ফিরছে কাতার দিয়ে। বৈঠা পড়ছে সমানতালে।

বায়ু কোণে একবিন্দু কালি। চিলিক মিলিক ঝিলিক দেখা গেল গোটা কয়েক। কড়্ কড়্ কড়াৎ···

'হাওলাদার, সামাল্ সামাল্ · ফোঁপানি আইছে ঝউড়া কোণে।'

'জোর টান কৈবত্ত ভাইরা।'

'কাল বৈশাখী চিলিক মারে—ডোঙা সামলাও পারের রেতে।'

'যদি পাড় ভাঙে? খাড়ি পাড়?'

'হাওয়ার শোসানি (শব্দ) শোনো না? ঢুইকা পড়ো এই সোঁতা খালে।'

পিঠের ওপর দিয়ে ঝড় যায়। গাছ ভাঙে মড় মড় করে, নদী নাচে প্রলয় নাচন—যেন পাগলা সাপুড়ে হাজার হাজার সাপ খুলে দিয়েছে।

ওরা কাঁদে না, কাঁকায় না। ঝড় থামলে বাড়ি ফিরে চলে গল্প গুজব করতে করতে।

কিন্তু একি? অনেকেরই ভেঙে গেছে ছনের ছাউনি, তুবড়ে দুমড়ে গেছে রান্নার একচালা। ওরা হাতে হাতে সারে। কি যেন মোহে ওরা বেঁচে থাকে। আবার পরামর্শ করে বর্ষার অভিযানের জন্য। এমন দরিয়ার পারে ধীবর বৃত্তি নিয়ে দিন গুজরান করতে হলে চাই বিশাল জাল, প্রকাণ্ড জেলে ডিঙি, নিদেন পক্ষে তিন খানা। আর তার সাজ সরঞ্জাম।

কাশেম আবার কয়েক দিনের জন্য গা ঢাকা দেয়। ওকে কেন্দ্র করেই তো এই পল্লী। ওকে কেন্দ্র করেই তো এদের সুখ দুঃখ। ওকে সামলাতে হবে সবদিক।

'কোথায় গেল হাওলাদার?' দিবারাত্রে এমনি পঁচিশ বারও কি প্রশ্ন হয় না!

কোন জবাব দিতে পারে না ফুলমন। ওকে না জানিয়ে যে এমন উধাও হলো তার জন্য এক একবার রাগ হয়, চিন্তা হয় ফুলমনের। কিন্তু আজকাল একটু একটু রাগ সামলাতে শিখেছে—শিখেছে বুদ্ধি খাটিয়ে উপস্থিত সমস্যাটা নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে।

সন্ধ্যার পর যখন ফুলমনের আঙিনায় রূপালী চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে—হালকা হাওয়া বেড়াগুলো ঝক ঝক করে ওঠে, ও তখন একা একা আর ঘরে বসে থাকতে পারে না। পাগল করে আমের বোলের মিষ্টি গন্ধ। সে হাওলা বেড়ার আড়াল থেকে একটু বাইরে বার হয়। চেয়ে দেখে চরকাশেম স্নান করছে চাঁদের আলোতে। রূপালী বেলে চর বড় অপরূপ হয়ে উঠেছে। সে নরম বালির ওপর পা ফেলে ফেলে হাঁটে। দুএকটা কাশফুলের গুচ্ছ ছিঁড়ে নেয়। কত মসৃণ, কত নরম। ফুলমনদের বাড়ির উঠানে একটা ফুলগাছ আছে। সেই ফুলেরই সে যেন গন্ধ পায় কাশের ফুলে।

পিছন থেকে এসে কাশেম তার হাত জড়িয়ে ধরে। 'ফুলপৈরী যে বাইরে।'

ফুলমনের চোখে জল আসে। 'থাউক থাউক অত আদর করা লাগবে না। গেছিলা বুঝি গঞ্জে? ক্যান্?'

সে কাশেমের নিকট থেকে ছুটে পালায়। দূরে গিয়ে একটা বালির ঢিপির ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। জ্যোৎস্নায় তার গৌরবর্ণ বালিমাখা পা দুখানা ছিকমিক করে ওঠে। যেন অভ্রের খনি ভেঙে এসে বসল এক অভিমানিনী নারী। কাশেম ধরতে যায়। 'রাগ করে না ফুলমন, রাগ করে না অত।'

ফুলমন তো বাধ্য মেয়ে নয়, চির চঞ্চল, চির অবাধ্য। সে আবার ছুটে চলে। এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আসে একটা ঝাঁকড়া ছোপা। এবার সে আর কাঁদছে না। খেলছে তার বোকা দরদী খসমকে নিয়ে। আর এত আলোতে কি ভাল লাগে আঁধার ঘর। কতদিন সে ছুটোছুটি করেনি! লুটোপুটি করেনি সরমে। বধূর সামাজিক বাঁধন সে আজ ভুলেছে—মেতেছে খোলা মেলা জ্যোৎস্নাভরা চরের মাঠে।

অনেকক্ষণ বাদে কাশেম হয়রাণ হয়ে পড়ে। সে এমনিতেই পরিশ্রান্ত। 'থাউক আর পারি না।'

ফুলমন ধরা দেয়। সেও কম ছোটেনি। 'ক্যান গেছিলা গঞ্জে?'

কাশেম তার মনোতৃষ্ণা আগে মিটিয়ে নেয় ঠোঁট দিয়ে ওর ক্ষীণ কাঁখাল বেষ্টন করে। তারপর বলে, 'নাও গড়াইবার ফরমাইজ দিতে।'

'কইয়া গেলে পারতা না?'

'পারতাম তো। তুমি আবার কিসে কি ভাবো। এ্যামনেই তো নাম শোনতে পার না ঠারৈণ দিদির।'

'এখন তো না-কইয়াও পারলা না।' হেসে ফেলে ফুলমন। একটা সন্ধি হয়ে যায় দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘরে ফিরে আসে। সারা দিনের সমস্ত ক্লেশ দূর হয়ে যায় কাশেমের।

আবডালে দাঁড়িয়ে আঞ্জু প্রেতনীর মত উদগ্র চোখে চেয়ে থাকে।

১৭

দুটি একটি টাকা নয়—প্রায় সাড়ে তিনশ টাকা দেনা হয়েছে কাশেমের। বিনা খতে শুধু মুখের কথায় টাকা দিয়েছে প্রমীলা। কাশেম আবার শুধু নিজের জন্য নয়—আনছে একটা গ্রাম রক্ষা করতে। ধীরে ধীরে ও যেমন গোপনে এনেছে তেমনি গোপনেই শোধ করে দেবে।

নৌকা আসতে প্রায় মাস খানেক দেরি। ছোট নৌকা তো নয় যে ফরমাইজ দিয়েই নামিয়ে আনল 'হাওলা' থেকে। সোয়াশ-হাত লম্বা তো হবেই—বরঞ্চ বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। কাশেমের কথা মত হাফেজ সোয়াশ হাত জমি মাপে।

'এই এত বড় এক এক খান। হাওলাদার তুমি এবার সওদাগর হইবা।'

'খুশি হইলে এবার সকলে সাজ গড়াও। কত চালি বাঁশ বাখারী বৈঠা দড়ি যে লাগবে!'

'রজনী যে কথা কও না?' হাফেজ প্রশ্ন করে।

'কমু কি! আমি মাপটা দেখলাম—ফোঁফানির সময় তিন তিনডা ঢেউ পাইবে কিনা আগায় মাজায় পাছায়।'

আর একজন বলে, এ সেই শান্তি কৈবর্ত। 'কিছু দেখা লাগবে না—হাওলাদারের আইজ কাইল ঢেউ জেয়ান পাকা হইছে। দিন রাত্তির চচ্চা করে যে শাস্তর তাতে হইবে ভুল!'

রজনী বলে, 'তুই ওঠ এখান থিকা। কাজের সময় ফাইজলামি।'

'তুমি বুড়া হইলা তবু তোমার কাম কমলো না।'

শান্তি এমন ভাবে ব্যঙ্গ করে যে রজনী রাগে গড়গড় করতে করতে চলে যায়।

সকলে হাঃ হাঃ করে হাসে। 'আরে রাগ হও ক্যান্ পাগলের কথায়। শোনো শোনো রজনী।'

হাফেজের ডাকে রজনী ফিরে আসে। আবার বৈঠক বসে। যে কদিন নৌকা না আসবে সে কদিন চলবে কি করে? আবার নৌকা আসার আগে চাই প্রকাণ্ড ইলশা জাল। তাতে কাঠি ঝুলাতে হবে এবং ভারসাম্য করে সাত আট হাত জলের নীচে ভাসিয়ে রাখতে হবে ফাঁকা তিত্ লাউয়ের ছোট ছোট খোলার সঙ্গে। কোনটাই দামি জিনিস নয়। এক স্থতো এবং মাটির কাঠি ছাড়া কোনটাই হাটে বন্দরে কিনতে পাওয়া যাবে না। আনতে হবে খুঁজে খুঁজে মহা পরিশ্রম করে। তিত্ লাউ জোগাড় করাই তো এক সমস্যার ব্যাপার।

তবু সবই সংগ্রহ হবে—শুধু এই কটা দিনের আহার্য চাই। শুধু চাল আর নুন। অন্য সব কিছু বাদ দিয়েও পরম সন্তোষে নিতান্ত আগ্রহে জেলে গৃহিণীরা সংসার চালিয়ে নেবে কেবল ঐ দুটি জিনিস জুটিয়ে দিলে। তারপরও তো তারা বসে থাকবে না। স্থতো তুলবে, গাব কুটবে, করবে রকমারী সাহায্য। জাল তো একরকম তারাই বুনবে রাত জেগে। মেয়েদের হাতই চলে বেশি।

কাশেম না হয় আর কয়েক 'গাড়ি' স্থতো এনে দিতে পারবে বন্দর থেকে মহাজনের খাতায় নাম লিখিয়ে। কিন্তু এতগুলো মানুষের আহার্য জোগাবে কি করে?

রসময় বলে, 'এ কটা দিন দেখতে দেখতে খুঁটে খেয়ে চলে যাবে। জোর একটা মাস বই তো না।'

হাফেজ ডাহুক ধরবে। কৈবর্তরা কচ্ছপ কোপাবে—সুবিধা মত ধরবে মাছ। রহিম এসব মারবে না। সে যাবে একখানা নৌকা ভাড়া করে কেরায়া বাইতে। নদীতে বসে সে তার ভাগের জাল বুনে আনবে যদি একা একা আঞ্জু বুনতে না পারে।

প্রকৃতি সম্পদ বহুলা। এমনি করে তার ভাণ্ডার লুট করে ওরা চালিয়ে দেবে এ কটা দিন। তারপর ওদের সারা জীবন আর ভাবতে হবে না। নৌকা হলে কাশেমের সঙ্গে সঙ্গে চরকাশেমের বাসিন্দারারও হবে ছোট ছোট সওদাগর। কাশেমের কাল্পনিক চরের সঙ্গে এ চরের হুবহু কোনো মিল নেই সত্যি—তবু কি বাস্তব মধুর নয়? মধুর নয় কি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে সংগ্রামশীল জীবন?

'আর কি চাও, নাও আইবে নাও।'

সব ঘরেই পুরুষদের এক কথা। মেয়েরাও আশায় অধীর। পোড়া কয়লার দাগ দিয়ে তারা দিন গোনে একটি একটি করে।

শুধু রহিম তার ছেলে দুটিকে নিয়ে যায় কেরায়া বাইতে। যাবে দক্ষিণে —ধান চালের দেশে। আঞ্জু থাকবে মেয়েটাকে নিয়ে। তার খরচ হাওলাদারই চালিয়ে নেবে।

চর কাশেমের বাসিন্দাদের ওপর দুরন্ত চাপ পড়েছে। বন্যপশুর মত সংগ্রাম করতে হচ্ছে জীবিকার জন্য—যে সংগ্রাম সুসভ্য মানুষ কল্পনা করতে পারে না। তারপর চলছে নৌকায় সাজ সজ্জার জন্য অমানুষিক খাটুনি।

তবু সন্ধ্যার পর যখন চরকা চলে, কিংবা দড়ি পাকান হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে চলে গান অথবা গল্প। একজনে বলে, দশজনে হাঁ করে শোনে আর তালে তালে কাজ করে। দেখতে দেখতে গৃহস্থ বৌরা জেলে বৌদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্না পক্ষে চরকাশেমে কেউ আর সহজে চোখ বোজে না। চঞ্চল জীবন যেন উছলে পড়তে চায়। চায় প্রতি দিনটিকে কর্মে ও দাক্ষিণ্যে ভরপুর করে তুলতে।

নদীপথ ধরে যারা অসময়ে যায় তারা সোঁতা খালে এসে নৌকা ভিড়ায়। মুগ্ধ হয়ে গল্প অথবা গান শোনে। স্বজাতি হলে এক সঙ্গে পানাহার করে নিজের দুর্বল ব্যথা বেদনার ইতিহাস জানিয়ে সহানুভূতি অথবা আশ্বাস, নয় তো আশীর্বাদ কুড়িয়ে নেয়। যাওয়ার সময় হয়ত কেউ কেউ মিতালী পর্যন্ত পাতায়। যে মিতালী কথার হেঁয়ালী নয়—দরদ ও মাধুর্যের। তাই আবার যখন ঐ পথে ফেরে, এসে ঠিক জায়গা মত নাও রাখে। আবার হাসে কাঁদে, তারপর ভোরের

গোধূলীতে বিদায় নিয়ে কোথায় যেন কোন্ অজানা অচেনা জায়গায় চলে যায়। কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্য হলেও একটা ব্যথার আঁচড় রেখে যায় বহুদিনের জন্য চরকাশেমের বুকে।

এমনি করেই দিন প্রায় ঘনিয়ে আসে। কাশেমকে সকলে গরজ করে একবার গঞ্জ থেকে ঘুরে আসতে বলে। কাশেম একটু হেসে বলে যে এখনও দেরি আছে। কিন্তু সে কথায় কে কান দেয়।

'যাও না হাওলাদার। আগে ভাগেও তো হইতে পারে। খবরডা লইয়া আসা ভাল।'

অনেক পীড়াপীড়ির পর অগত্যা কাশেম রাজী হয়।

সে এবারে হেঁটে যায় গঞ্জে। কষ্ট হয় তার খুবই। কারণ পায় হাঁটা তো অভ্যাস নেই। কিন্তু সকল কষ্ট তার দুর হয়ে যায় ঠারৈণদিদির মুখ দেখে।

প্রমীলা যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। 'তুই এসেছিস কাশেম? আজ না এলে কাল তোর জন্য নাও পাটাতাম।'

'ক্যান্, এত গরজ কিসের? এখন তো ঠারৈণদিদি টাকা দিতে পারুম না।'

'তোর কাছে টাকা চেয়েছি নাকি রে? এমন পাগল তো দেখিনি কোনখানে? ও কটা টাকা কি আমি ফেরৎ নেব নাকি?'

'না ঠারৈণদিদি চরকাশেমের বাসিন্দারা ধার নেছে, শোধ কইরা দেবে—আমি তো খালি জামিনদার। কেউরে দেনদার রাইখো না।'

'বড় বড় কথা বলা লাগবে না। আমি তো তাদের চিনি নে—চিনি তোকে। মায়ের কাছে ছেলের আবার দেনা কিসের রে? তবে তো আমার মাথাটা বিকিয়ে গেছে অনেক আগে।'

যথেষ্ট চিড়া মুড়ি ফল মূল এনে দেয় প্রমীলা—এই মাত্র তার পূজা সাঙ্গ হলো।

প্রমীলা বলে যে জগদীশের শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে তাই একবার তীর্থে যাবে। হয়ত শেষ বয়সে আর শক্তি সামর্থ থাকবে না। 'সেই সঙ্গে আমিও যাব।'

ইতিমধ্যেই কাশেমের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'আবার ফেরবা কবে?'

'জানি নে বাবা—ঠাকুরের ইচ্ছা। যদি শরীর বেশি খারাপ হয় তবে হয়ত উনি শ্রীবৃন্দাবনেই থাকবেন।'

'আর তুমি ?'

প্রমীলা একটু ম্লান হাসি হাসে।

কাশেম আর খেতে পারে না। তার কাছে দুনিয়া ঝাপসা হয়ে আসে।

'হাত তুলিস নে কাশেম, খা—খেয়ে ফেল। তোর কোনো ভাবনা নেই। এখানে ওঁর বড় ছেলে রইল—পাশ-করা বিদ্বান ছেলে। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে যাবো। যখন যা দরকার এসে চেয়ে নিয়ে যাস।'

কাশেমের মনে মনে রাগ হয়। তার সঙ্গে কেবল বুঝি লেন-দেনের সম্পর্ক ? সে আর পরিচয় করে না জগদীশের ছেলের সঙ্গে। তার মনে হয় ওর জন্যই বুঝি আজ প্রমীলা এখান থেকে চলে যাচ্ছে। বিদ্বান এবং বয়স্ক ছেলের সুমুখ থেকে জগদীশ গা ঢাকা দিচ্ছে। নইলে এমন কি শরীর খারাপ হয়েছে বুড়োর।

কাশেম এড়িয়ে যেতে চাইলেও প্রমীলা এই তাড়াহুড়ার মধ্যে জগদীশের বড় ছেলেকে কাছে ডেকে, তার হাতের মধ্যে কাশেমের হাত দুখানা দিয়ে কি জানি বলতে চায়—কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

প্রমীলার অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে জগদীশের ছেলে তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, অধীর হওয়ার কিছু নেই—সে অবুঝ নয় মোটেই।

একটা দিন অপেক্ষা করে কাশেম ষ্টিমারে তুলে দিয়ে যায় প্রমীলা ও জগদীশকে। প্রণাম করে দাস-দাসী-গোমস্তা-কর্মচারীদের মত। তারপর জেঠিতে নেমে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

ষ্টিমারটা আজ পাঁজরা-ভাঙা আর্তনাদ করে বিদায় নেয়।

কাশেম ফেরে। হেঁটে আসার শক্তি সে যেন হারিয়েছে। তাই ফেরে কেরায়ার নৌকায়।

বাড়ি ফিরলে ফুলমন সকলের আগে জিজ্ঞাসা করে, 'কি নায়ের খবর কি ? বড় যে মুখখান শুকনা ?'

'নায়ের খবর তো জিগাইতে ভুইলা গেছি।'

'ভাল ! তয় গঞ্জে গেছিলা ক্যান ?'

কাশেম সব কথা খুলে বলে।

ফুলমন নিশ্চিন্ত হয়। কেন জানি তার বুকের ভিতরটা আজ হালকা লাগে।

আবার দুদিন বাদে কাশেম গঞ্জের দিকে রওনা হয়। সঙ্গে যায় কয়েকজন। এবার যায় ডোঙায় ;

নৌকা গড়ান হয়ে গেছে। নৌকা দেখে তো সকলে আনন্দে অস্থির।

হাওলা থেকে নৌকা নাবান হয়নি, এখনও 'তেরছি' দিয়ে দুদিক আটকান কিন্তু ওরা কাঠের চাঁছাছোলা সব পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে।

মিস্ত্রীরা দেখে একটু হাসে। 'কেমন নাও হইল হাওলাদার? একেবারে ময়ূরপঙ্খী। পদ্মা মেঘনা যেখানেই দেও আর ভয় নাই। এই মাস্তলের 'গুড়া'— মাস্তল খাটবে বড় একটা বডা বাঁশের, পাল খাটবে একজোড়া। কেমন পছন্দ-মত হইছে তো?'

একজন নৌকা মাপতে চায়।

'দেখো দেখো মাইপা—কিছু 'বলন' আছে। সেইটুকু কাইটা রাইখা যাইও।'

আর কেউ মাপে না।

'আরে ভয় পাইলা নাকি? আচ্ছা, কাইটা রাখতে হইবে না—এইবার মাইপা দেখো।'

তিনজনে তিনখানা 'নাও' তিন রকম মাপে। অথচ হাওলার পাশাপাশি তিনখানা নৌকাই সমান। ওরা তিনজনেই শুধু কানা-ঘুষা করে আর মাপে। তিন চারবার মাপার পর সকলের মাপ এক হয়।

'কি হইল?'

'ঠিক হইছে।'

এতক্ষণ যে মিস্ত্রী কথা বলছিল সেই জিজ্ঞাসা করে, 'কত?'

তিনজনে তিনজনার মুখের দিকে তাকায়। কে আগে বলবে এবং ভুল বলে হবে হাস্যাস্পদ।

এরপর মিস্ত্রী উঠেই মেপে দেখিয়ে দেয় সোয়া শ হাত এক মুঠুম। এ এক মুঠুম ফাউ। বাকিটার দাম দিতে হবে।

টাকাপয়সার আদান-প্রদান হলে তিনখানা নৌকা নদীতে নামিয়ে পাশাপাশি বেঁধে দেওয়া হয়। এখন একটু জল উঠবে—অনেকটা ঘামের মত। তা বাড়িতে গিয়ে গাব আলকাতরা দিলেই বন্ধ হবে।

কাশেম মনে মনে ভাবে: নৌকা না তো মিস্ত্রীরা যা বলেছে তাই সত্য— ময়ূরপঙ্খী। ওরা তিনজন মিলে লোকচক্ষুর সুমুখেই প্রলুব্ধের মত নায়ের গায়ে যেটুকু হাত বুলিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হাত বুলায় কাশেম। এতটুকু কাদা পর্যন্ত ধুয়ে মুছে ফেলে নিজের গামছা ভিজিয়ে। 'পানের কাদা খায়, নায়ের কাদা গায়—একটু হুঁশিয়ার হইয়া হাত পা ধুইয়া উইঠো মণিরা।'

নৌকা তিনখানা তিনজন নর্তকীর মত নাচতে নাচতে যেন এগিয়ে চলে চরকাশেমের দিকে।

তিনজনে তিনখানা হাল ধরে ভাটিয়ালী গান জুড়ে দেয়।

'কত হইল?' একজন জেলে প্রশ্ন করে, 'বড় বাহাইরা ঢক্ হইছে তো!'

'সোয়া তিন শ।' কাশেম জবাব দেয়।

'এ্যা—মাগনা দেছে!'

তার উত্তরে কাশেম যে গঞ্জে কতখানি প্রতিপত্তি রাখে প্রমীলার জন্য তাই খুলে বলে। খুলে বলে প্রথম পরিচয়ের ইতিবৃত্ত।

ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর দিয়ে আবার নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে নৌকাগুলো।

খালের ঘাটে নৌকা ভিড়তেই আজ মুসলমান পাড়ার পরদা আব্রু ঘুচে যায় —হিন্দু বাড়ির বৌঝিরা আসে শাঁখ নিয়ে। মত পৃথক হলেও, মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হয় না। জান যে বাঁচাবে তাকে যে-যার মনের মত করে বরণ করবে, এতে দোষ কি! ওরা বরঞ্চ খুশী হয়ে চেয়ে দেখে হিন্দু বৌদের কাণ্ড-কারখানা।

ফুলমন এক বৌর হাত থেকে একটা শাঁখ কেড়ে নিয়ে গোটা কয়েক ব্যর্থ ফুঁ দিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ে।

এক সময় কাশেমকে একান্তে পেয়ে আঞ্জু বলে, 'ঘরে একখান, বাইরে তিনখান —নাও হইল চাইরখান, একটু বুইঝা-সুইঝা বাইবেন।'

কাশেম চেয়ে দেখে, আঞ্জুর চোখ ঠিক রহস্যময় নয়, অগ্নিগর্ভ। সে একটু শংকা বোধ করে।

১৭

সব সাজসরাঞ্জম নৌকায় উঠেছে। নিরাভরণ নৌকা তিনখানা পড়েছে আভরণ। এখানে বাকি আছে কি! সাধারণ জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন তা তো রয়েছেই। তার অতিরিক্তও অনেক কিছু আছে। আছে দড়ি কাছি জাল নোঙর, নানা রকম হাল্কা ভারী অস্ত্র। সবই সঙ্গে থাকা চাই। কখন কোনটা লাগে বলা তো যায় না।

রহিমের জন্য আজ কদিন নৌকা খোলা হচ্ছে না। তার ফেরার সময় উৎরে গেছে। চিন্তিত হয়ে পড়েছে চরের বাসিন্দারা। কোথায় গেছে কাউকে বলেও

যায়নি—এখন আন্দাজে কি তল্লাস করা যায়? হাটে হাটে খবর নিচ্ছে কাশেম, ঘাটে ঘাটে জিজ্ঞেসা করছে ঘাট-মাঝিদের তবু কোন হদিস মিলছে না। নদীর বাওড়ে বাওড়েও লোক পাঠান হয়েছে। কি জানি সারা রাত হয়ত আওড়-বাওড় বেয়ে হয়রান হয়ে পড়েছে। রাত-কানায় মাঝি মাল্লাদের একা পেলে এমনি নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে! ওগুলো জিন পরীর থেকেও কম মারাত্মক নয়। নৌকা ডুবিয়ে ঘাড় মটকে রেখে যায় নদীর আনাচে কানাচে কিংবা বড় ফাটলে।

অনেক খোঁজখবরের পর একটা মৃত দেহের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু নায়ের খোঁজ মেলে না। ছেলে দুটোরও না। শবটা ফুলে এমন পচেছে যে তা সনাক্ত করা কঠিন।

কাশেম ভাবে কোনো 'ফোঁপানীতে' পড়েও মরতে পারে নৌকা। কিছুই ঠিক সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না।

আরও কটা দিন যায় তবু রহিম ফেরে না।

চরকাশেমের বাসিন্দাদের আর দেরি করা চলে না। তারা এক জ্যোৎস্না পক্ষে, চতুর্দশী কি মঘা বাদ দিয়ে 'বদর বদর' বলে পাড়ি জমায়—যাবে একটু উত্তরে। দিন দেখিয়ে নিয়ে আসে রসময়ের কাছ থেকে।

কাশেম বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় ফুলমনের পাশে আঞ্জুকে এসে শুতে বলে। ফুলমন ঠিক না করতে পারে না—কারণ আঞ্জুর চলেছে একটা সাংঘাতিক দুঃসময়, তবে তার আদৌ ভাল লাগে না। সরলবুদ্ধি পুরুষগুলো এমনি করেই গর্তে পা দেয়।

প্রায় মাস খানেক পর্যন্ত ওরা বাড়ি ফেরে না। মাঝে মাঝে কিছু সস্তা দরে রেঙ্গুনের চালানী চাল এবং সওদা বেসাতি এক একজন এসে দিয়ে যায়। আর নিয়ে যায় আবশ্যকীয় জিনিসপত্র। আরও একটা মাস গত হয় তবু রহিমের খোঁজ মেলে না। এবার সকলে নিঃসন্দেহ হয় যে সে মরেছে। তাই আঞ্জুও কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাকে অনেক সান্ত্বনা দেয় ফুলমন ; নানা প্রকার কাজে ডুবিয়ে রেখে সে ওকে ভুলিয়ে রাখে। এখন ফুলমনেরও যথেষ্ট দায়িত্ববোধ জন্মেছে। চরের বড় গিন্নীই সে।

একদিন কতগুলো হাঁসের ছানা কিনে এনে আঞ্জুকে লালনপালন করতে বলে। উঠানের মধ্যেই একটা চৌবাচ্চার মত পুকুর খুঁড়ে দেয়। ঐ জলে ছানাগুলো ভাসবে—খাবে ছোট ছোট ক্ষুদের কণা। রেঙ্গুনের চালে সে কণার অভাব নেই মোটে।

ফুলমন নিজের ব্যয় লাঘব করার জন্য আঙ্গুর পাঁচ বছরের মেয়েটার বিয়ের একটা ঠিকঠাক করে রাখে হাফেজের আড়াই বছরের ছেলের সঙ্গে। বিনা পয়সায় ছেলের বিয়ে হবে এ কথায় হাফেজের বৌ খুব খুশী হয়। এখন সকলে চরে ফিরলেই এ শুভ কাজটা হয়ে যেতে পারে।

এবার চরকাশেমের বাসিন্দারা বেশ সুবিধাই করে। যা মাছ পায় তা তো মুনাফা করেই বেচে—কিছু টাকা দাদনও নিয়ে ফেরে পাইকারদের কাছ থেকে। ওদের নৌকা এবং জালের ভরসায় দাদন দেয় পাইকারেরা। ওরা আনন্দে যে যার সুখ্যাতির ও পৌরুষের ব্যাখ্যা করতে থাকে।

বিয়ে হয়ে যায় রহিমের মেয়ের। ফুলমনই সব ঘটিয়ে দেয়, তাই কাজ হয় তাড়িতাড়ি।

পরের বার চোরে প্রায় হাত চল্লিশেক জাল রাত্রি বেলা কেটে নিয়ে যায়। জালের দাম তেমন বেশি নয়—অসুবিধা হয় মাছ ধরতে। ওরা দাদনের টাকা শোধ না করতে পেরে এ ওকে মন্দ বলতে বলতে বাড়ি ফেরে।

'সক্কলেই বেহুঁশিয়ার।'

আবার সুতো কিনে এনে জাল বোনা আরম্ভ হয়। যে কদিন বোনা শেষ না হয়, সেই কটা দিন কাটাবার জন্য কাশেম বলে, 'এক কাজ করো—তোমরা শুইনা হাসবা, না হইলে বলি।'

'বলোই না হাওয়ালদার, কেও হাসবে না।' হাফেজ অনুরোধ করে। 'কও না?'

'দশ দশ হাত লগির গোড়ায় সব খাড়া জাল বান্ধ—রাত্তিরে মজা দেখামু।'

'কি মজা দেখাইবা? আমরা এমন কি দোষ করলাম? জাল চুরির দিন তুমিও তো নায় ছিলা।'

এমন সময় আঙ্গু আসে।

'আরে সে সব না। বেহাই ছাহেব কিছু কবুল করলে আমি কইতে পারি।'

'কি কবুল করুম?'

'তয় বাজি ধরেন—যে কইতে পারবে তারে নগদ একটা টাকা দেবেন।'

আঙ্গুর চেহারার বাহার সধবা থাকতেও এত ছিল না, চুলের ছাঁদুনিও এমন কখনও দেখে যেতে পারেনি রহিম। এমন বেয়ানের সঙ্গে টাকা বাজি রাখা তো দূরের কথা 'জান' বাজি রাখলেই বা দোষ কি?

'আমি হাওলাদারের কি কথা না জানি!'

একটা শাসানি আসে। 'আঞ্জু!' আঞ্জু ত্বরায় ফিরে যায়।

ফুলমন জ্বলন্ত কটাক্ষে চেয়ে আছে। 'এদ্দাতের কয়ডা মাসও কি সবুর সইবে না তোর?'

আঞ্জুর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

সমাজে নিয়ম আছে, যে ছটা মাস অপেক্ষা না করে ভিন্ন স্বামীর অনুগামিনী হওয়া অপরাধ, এই কথাটাই বারবার তীব্র স্বরে বুঝিয়ে দেয় ফুলমন।

এই কিছু দিন পূর্বে আঞ্জু ভেবেছিল বিষ খাওয়াবে ফুলমনকে—কিন্তু নানা কার্য-কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সে অপেক্ষা করে ছিল পরবর্তী সুযোগের জন্য। আজ তার মন আবার জ্বলে উঠেছে ফুলমনের কঠোর ব্যবহারে।

তার স্বামী গেছে, সংসার ভেঙেছে—এখন আর সে ডর-ভয় করবে কাকে? সে চরকাশেমে আগুন জ্বালাবে, নয়ত ফুলমনের থাবা থেকে কেড়ে নেবে ময়ূর-সিংহাসন।

দিনের বাকি সময়টা আঞ্জু গায়ের জ্বালায় গজগজ করে কাটায়। কাজ করতে গিয়ে এটা ওটা ভাঙে-চোরে।

দেখে শুনে ফুলমনও তপ্ত তাওয়ার মত তেতে থাকে।

সন্ধ্যার পরই বাধে সংঘাত।

'সোয়ামী পুত্তুরের মাথা খাইয়া এখন আমার মাথা খাইতে চায়। এ অলক্ষ্মী যে হাওলাদার কেন আমার ঘাড়ে চাপাইছে। সেদিন নয়া পাইলাডা (হাঁড়িটা) আনাইছি চাইর আনা দিয়া তা ভাঙছে, ভাঙছে শক্ত-পোক্ত কুলাখান।'

'ভাঙার দেখলা কি! শ্যাষকালে তোমার কপাল ভাইঙা লাইমা (নেবে) যামু।'

'আমারডা খাইয়া-পইরা এই কথা কও!' ফুলমন অবাক হয়ে থাকে। 'সাধে কয় ছোট জাইত—একেবারে নেমকহারাম।'

'তোরডা খাই না—খাই গায় খাইটা, হাওলাদারেরডা। তুই মুখ সামলাইয়া কথা কইস শয়তানের ঝি!' আঞ্জু এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। 'আমি নাকি ওরডা খাই—হুঁঃ। উইড়া আইসা জুইড়া বইছেন গদি!'

'তয় কি তোর বাজানেরডা খাও? হাওলাদার কি তোর বাজান?

'না লো, তোর মাগী।'

ফুলমন লাফিয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যে একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়।

হঠাৎ কাশেম এসে পড়ে। 'একি, একি! থামো থামো ফুলমন।'

দু'জনেই থামে।

আঞ্জু কেঁদে কেটে যা বলতে পারে, ফুলমন তা পারে না।

স্বভাবতই কাশেমের সহানুভূতি আকর্ষণ করে স্বামীপুত্রহারা আঞ্জুমান।

'এখন কি ওরে এই সব কইতে হয়—ছিঃ ছিঃ !'

ফুলমন ঘর ছেড়ে উঠানে নামে। কাশেম অনেক করে প্রবোধ দেয় আঞ্জুকে। আঞ্জু চোখ মোছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে কাশেমের অনুনয়-বিনয়, আকুতি-ভরা কথা। 'এই সেদিনও তো তুমি আমার লাইগা কত করছ—তা কি ফুলমন জানে? আর জানলেও কি সে বোঝে। বড় ঘরের ঝি এট্টু রাগ বেশি, তুমি আঞ্জু ভুইলা যাও ওর কথা।' অবশেষে কাশেম নিচু গলায় বলে, 'আমি তোমার কাছে দেনায় কেনা হইয়া রইছি।'

আঞ্জু ফিক করে হাসে। কটি ডালিম দানার মত দাঁত দেখা যায় টলটলে।

১৮

কলহের জের মিটতে না মিটতে কাশেমের ডাক পড়ে।

সোঁতা খালটার পারে চুপ করে দাঁড়িয়ে চরের জেলেরা কান পেতে রয়েছে। জোয়ারের জলে খালটা কানায় ভরে গেছে। অন্ধকার পক্ষ—স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'কই হাওলাদার ?'

'চুপ—ঐ শোননি শব্দ। বেশি কথা কইলে সব মাটি হইবে।'

অনেক দূরে খালের আগায় দুটো গম্ভীর শব্দ হয় জলের মধ্যে।

'শোনলা এবার ?'

'এখন নায়ে উঠুম ?'

'ওঠো ?'

'জাল পুতুম খালের আড়াআড়ি ?'

'এখনও জিগাও ?'

ভাঁটার সময় যে খাল একরকম শুকিয়ে থাকে—এখন জল তিন চার হাত। এক মাথা চরের মধ্যে গিয়ে ডাঙায় মিশেছে, অন্য মাথা গেছে নদীর দিকে। সে দিকেই পড়ে জালের ফাঁদ। দুটো বড় ভেটকি মাছ উঠেছে খালে এবং প্রতি দিনই জোয়ারে ওঠে, ভাঁটায় নেমে যায়। মাছজোড়া প্রকাণ্ড তা অনেকদিন লক্ষ্য করেছে কাশেম। চোখ চারটা ভাঁটার মত জলজল করে।

জাল পাতা হলে দু'তিন জনে ডুবিয়ে দেখে যে জালের তলে কোন ফাঁক আছে কি না?

'ক্যামন হইছে? এখন আয়ো এই দিকে।'

সকলে মিলে হাতাহাতি খন্তা চালাতে থাকে। একটু কৃত্রিম খাল কাটতে হবে জালের একপাশ দিয়ে কূলের ভিতর দিকে। নিদেন পক্ষে হাত পাঁচেক হওয়া চাই। ভাটা হলে জাল বেয়ে বেয়ে মাছ এসে ঐ খালে ঢুকবে—ভাববে, এইখানটা ফাঁকা, কিন্তু উঠবে গিয়ে ঠেলে কূলে। আর কি রক্ষা আছে! তখন হাতিয়ারের ঘায় সব সাবাড়।

মাছ দুটো ধরা পড়ে। অন্ধকারে চোখ চারটা দেখায় আগুনের ভাঁটার মত। পাইকার এসে কিনে নিয়ে যায় চড়া দামে সকাল বেলা। এমন মাছ নাকি সচরাচর দেখা যায় না।

চোখ চারটায় এখন আর দীপ্তি নেই, কিন্তু কাতরতা আছে মরা মানুষের মত।

জাল পেতে দিয়েই কাশেম বাড়ি ফিরেছে। ফুলমন যে রাগী মেয়ে! কোন্ না গলায় দড়ি দিল—ওর পক্ষে আশ্চর্য নয় জলে ডুবে মরাও।

কিন্তু সে কিছু করেনি। শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে দাওয়ায়। রান্না-বান্না শেষ করে আঞ্জু নিজের বাড়ি চলে গেছে। ঘরের ভিতর লোটা বদনা, সানকি নুনদানী সব ঠিকঠাক।

'ওরে আর এখানে আমি ওঠতে দিমু না।'

'আচ্ছা দিও না। ভাবছিলাম জুদা (পৃথক) খাইলে খরচা বেশি, তাই এক সাথে রসুই করতে কইছিলাম। তোমারও সাহায্য হইত। যখন বনি-বনাত্ হয় না, তখন দূরে থাকাই ভাল।'

ফুলমন ভেবেছিল কাশেম আপত্তি তুলবে প্রবল, সেই সুযোগে সে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে। কিন্তু সে সুযোগ হয় না।

'চরে আমি থাকুম, না হইলে আঞ্জু—এখানে দুইজনের ঠাঁই হইবে না।'

'ক্যান বাড়ি তো জুদা—অসুবিধা কি?'

'ওরে চর ছাড়া করুম, তয় আমার নাম ফুলমন। ওরে না খেদাইয়া আমি পানি খামু না।'

'তা তুমি ক্যামনে পারবা ফুলমন? তুমি না বড় মানুষের ঝি! ওর এ দুনিয়ায় কেও নাই—চাইরডি ক্ষুদকুড়া দেওয়ার জনও।'

ফুলমন নিমেষে সব বোঝে। এই অভাগিনী বিধবা সহানুভূতি কুড়িয়ে নেয় ওর কাছে থেকে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। আবার ক্রোধে অস্থির হয়ে ওঠে ফুলমন। স্বামীর চরিত্রের ওপর একটা সন্দেহ জন্মে। ওরা এতকাল এক সঙ্গে বসবাস করছে, ভিতরে ভিতরে কি ঘটেছে কে জানে! আঞ্জু অভাগিনী নয়, অভাগিনী ফুলমন। কুল মান মর্যাদা তার সব গেছে, কিন্তু তার বদলে সে পেয়েছে কী? অসম্মান বঞ্চনা। ফুলমনের এবার কাশেমকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছা করে। তারপর নিজেকে। সে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

কাশেমেরও যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে যে ভোর হয়ে গিয়েছে। ফুলমন শয্যা ছেড়ে উঠেছে। হাঁস মোরগ ডাকছে খোপে। ওগুলোর খাবার নিয়ে যাচ্ছে ফুলমন।

রাত্রে ফুলমন ঠিক করেছে, চরকাশেম ওর যেমন ছেড়ে যাওয়া হবে না, তেমনি আঞ্জুকেও ছাড়া করা যাবে না। বাস্তব পন্থাই হচ্ছে ওকে কাছে রেখে কাজের চাপে দমন রাখা। তাতে ফুলমনের ঘরেরই শ্রীবৃদ্ধি হবে। আঞ্জুর কুঁড়েখানাও যাবে পড়ে। ফুলমন বেগম—বেগমই থাকবে, লোকের চোখে আঞ্জু হবে বাঁদী। ফুলমনকে অহর্নিশি চোখজোড়া খুলে রাখতে হবে। ছোট গণ্ডীর ভিতর না আনলে মেছো মেছুনীকে বাগে রাখা যাবে না। চরকাশেম ঐশ্বর্যসম্ভবা, তার লোভ ও কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটে। কিন্তু একঘেয়ে প্রহরীপনার ক্লান্তিতে দিন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। ও ছিল মুক্ত পাখি, সেই মুক্তি খোঁজে। কিছুতে না জড়িয়ে, শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া।

আবার জাল নিয়ে বের হয় বাসিন্দারা।

'ফেরবা কবে?'

'তা কি ঠিক কইরা কওয়া যায়?,

এবার ফুলমনের ভাল লাগছে না এসব কিছু। জীবনটা তার যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। কিছুদিনের জন্য ওপার যেতে চায়। হয়ত তা মোটেই চায় না—তবু জোর করে চায় একটা কিছু সে। কিন্তু ওপারে যেতে, মর্যাদা ও আড়ম্বর দেখাতে যে অর্থের প্রয়োজন তা কোথায়? কতদিন সে এমন ভাবে থাকবে? মায়ের জন্যও প্রাণটা কাঁদে।

সে যে উৎসাহ নিয়ে প্রথমবার কাশেমকে ঠেলে নদীতে পাঠিয়েছিল সে উৎসাহ আজ উবে গেছে। এর হেতুটা ঠিক ধরতে পারে না ফুলমন।

ফুলমনকে নীরব দেখে কাশেম আবার প্রশ্ন করে, 'তয় কি ক্ষান্ত দিমু এ যাত্রা যাওয়া ?'

ফুলমন অতি দ্রুত জবাব দেয়, 'না, না, না,—ক্ষান্ত দিলে চলবে কি কইরা ?'

কেমন যেন থতমত খেয়ে কাশেম দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমি তোমারে যাইতে বারণ করি নাই—কেবল জিগাইছিলাম ফেরবা কবে। এখন আর খাড়াইয়া থাইকো না, ওরা আবার ডাকাডাকি জুইড়া দিবে।' ফুলমনের চোখে জল এসে পড়ে।

কাশেম চলে যায় কিন্তু মনে মনে বুঝে যায়ঃ এত স্পষ্ট করে বললেও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে ফুলমনের হৃদয়ের কথা। সে বুঝি খাপ খাওয়াতে পারছে না এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে। যে ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে ফুলমন লালিতা তার পক্ষে এ অসঙ্গত নয়। বর্তমান কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তো তাদের সংসারে কোন চিন্তা ছিল না। চরো জমির ফসল বার মাস উঠছে একটার পর একটা। কাশেম নিজেকে বড়ই হীন বোধ করে। মনে হয় ফুলমন ও তার মধ্যে একটা আশমান-জমিন ব্যবধান।

দাঁড় টানতে টানতে কাশেম ভাবে এই ব্যবধান নেই আঞ্জু এবং তার মধ্যে। কতদিন ধরে এক জায়গায় কাটাল কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও তো নিজেকে হীন মনে হয় নি। এমন বৈষম্যের গ্লানি এসে তার কণ্ঠরোধ করে দাঁড়ায়নি। মাঝে মাঝে তার ভুল হয়ে যেতে থাকে দাঁড়ে থাবা মারতে। আঞ্জু আজকাল কেমন যেন সুন্দর হয়েছে দেখতে। শ্রী ফিরেছে বিধবা হয়ে।

এসব কি কথা ভাবছে কাশেম ?

না, না—সে যদি একটু চুরি করেও কিছু ভেবে থাকে তবু সে ফুলমনকেই ভালোবাসে। তাকে সুখী করতেই তো আজ সে নায়ে উঠেছে। ঝড়ে-বাদলে মাছ ধরবে, পাইকারদের সঙ্গে দরাদরি করে মাছ ছাড়বে, তুলবে টিনের চৌচালা ঘর। তার যা কিছু সকলই তো ফুলমনের জন্য।

আকাশের গোধূলির সঙ্গে সান্ধ্য নদীর যেন মিত্রতা। শাড়ি পরেছে রাঙা রঙের। কত গাঙ-চিল গাঙ-শালিখ ভেসে চলেছে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুখানা ডানায় ভর করে! আজ নদী শান্ত—স্রোত যেন বয়ে চলছে মন্দাক্রান্তা তালে। কত দেশের, কত গঞ্জের যে নৌকা পাল তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। খাড়ি পাড়ের ধার দিয়ে চলেছে কাশেমের তিনখানা নাও—তিনটা মাস্তুল হাল্কা পালে

ফেঁপে। এখন আর দাঁড় না টানলেও চলে। কিন্তু কাশেম নিরুদ্দেশে চেয়ে আছে কূলের দিকে। কত ফুলভরা জংলা গাছ অঞ্জলি দিচ্ছে অবিরাম। কত সুপারি গাছ হেলে পড়েছে ডুবন্ত সূর্যের দিকে। অজস্র শিকড়-বাকড় ভাঙাপাড় বেয়ে নেমেছে নদীর জলে। লজ্জাবতী লতার ঝাড় একটা ভাঙনের মুখে এসে এখনও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আছে যেন। একটা সুমধুর সৌম্যতা ফুটে উঠেছে আঁধারে।

কাশেমও তাড়াতাড়ি উঠে অজু করতে যায়। আজকাল তার পাঁচ ওক্তো নামাজ বাদ যায় না।

নামাজের শেষে সে খোদার দরবারে আরজি জানায় যে সে যার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিয়েছে তাকে যেন খুশী করতে পারে।

তাই কাশেম পরিশ্রম করে—অপরিসীম। একবার জাল তুলে তখনই আবার—অন্ধকার হক, আর তুফান আসুক—খলবলে নদীতে জাল ফেলে। পাইকারদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখে যথাসম্ভব। রোজ রোজ সে এক-আধ টাকা কম বেশির জন্য পাইকার বদলায় না। তবে যেবার মাছ কম ওঠে, সেবার কিছু অবিশ্বাসের কাজ করে। গণতিমুখে দুচারটা কম দিয়ে পণ মিলিয়ে দেয়। পাইকাররাও ভাল মানুষ বলে গোণার সময় লক্ষ্য রাখে না। কাশেম কি আর কম গুণে দিতে পারে? কিন্তু দামের বেলা তারা ইচ্ছে করেই বাজার দর নাবিয়ে বলে। তবু যার ভাগ্যে যা আছে তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

কাশেম এবার সব দিয়েথুয়ে পঁচিশ টাকা মুনাফা করে।

বড় আনন্দ হয় তার। এই পঁচিশ টাকা দিয়ে এখন কি করা উচিত? উচিত একবান টিন খরিদ করে নেওয়া। আর এক 'খেপে' আর এক বান কিনতে পারলেই তো কোনোরকমে ছাপরা দেওয়া চলে। তারপর আর কিছু।...একটু হিসেব করে চললে ঘর তুলতে কতক্ষণ। নিত্য নিত্য যেমন ঝড়-বাদলা লেগে আছে. নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ঘর একখানায় টিনের ছাউনির হলে। খাও না খাও চুপচাপ শুয়ে থাকো।

যাওয়ার সময় সে টিন কিনে নেবে।

ফুলমন যে ওপার যেতে চেয়েছিল, এ টাকায় তো তা কুলিয়ে যায়। অর্ধেকটা নৌকা ভাড়া অর্ধেকটা বাজে ব্যয়। যাওয়ার সময় একটা বড় খাসি নিয়ে যাবে—ডালা বোঝাই নেবে ঘি মসল্লা, সরু কাটারিভোগ চাল। কাশেমের একটা টুপিও কিনতে হবে ভাল দেখে। তুর্কী টুপি। লুংগি কিনতে হবে বেশ রঙিন এবং দামি। সে মেছো হতে পারে, কিন্তু তার কুটুম্বেরা তো মেছো নয়।

আরও অনেক কথা ভাবে কাশেম। পঁচিশটা টাকা আয় হয়েছে কিন্তু ফর্দ ধরে পাঁচশ টাকার। অবশেষে চলন্ত নৌকায় নদীর জলো জলো হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।

বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে খুব গম্ভীর ভাবে জালগুলো পাট পাট করে গুছিয়ে তোলে। জালের 'আরে' পাতলা করে জাল শুকাতে দেয়। আরও হরেকরকম নোঙর, বৈঠা, গুণতি করে উঠতে কাশেমের দেরি হয়ে যায়।

'হাওলাদার কি আনছ?'

'হাওলাবেড়ার বাইরে আইছ ক্যান—যাও আইতে আছি।' আজ যে আঞ্জু খাল-পার আসে তা কাশেম চায় না। তাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা। ফ্‌লমনই বা কি ভাববে!

কাশেম উঠানে এসে দেখে আঞ্জু দাঁড়িয়ে—একটু চটুল কটাক্ষে তাকাচ্ছে।

তাকে অগ্রাহ্য করে ডাকে, 'ফ্‌লমন, ফ্‌লমন!'

ফ্‌লমন জবাব দেওয়ার আগেই সে ঘরে প্রবেশ করে। 'এই নেও।' ঝনঝন শব্দ হয়।

ফ্‌লমন হাত পেতে টাকা গুণে দেখে। তার মুখেও হাসি ফোটে।

'যাবা নাকি ওপার?'

'খরচ?'

'এতেও হইবে না?' কাশেম একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, 'গুইণা দেখ, পঁচিশটা টাকা—কম না।'

একটু উপেক্ষার হাসি ঝিলিক মারে ফ্‌লমনের ঠোঁটে।

আঞ্জু টাকার শব্দ শুনে ভাবে: আজ যদি রহিম বেঁচে থাকত!

গরিবের পুঁজি। একটি দুটি করে খরচ হতে হতে হাত শূন্য হয়ে যায়। না হয় টিন কেনা, না হয় ওপার যাওয়া। তবু দিন আসে দিন চলে যায়। কাশেমের মন অপূর্ণ থাকলেও চরকাশেমের অন্যান্য বাসিন্দারা খুশী। তারা কিছুদিন মনে প্রাণে জীবিকার জন্য যুদ্ধ করে, আবার কিছুদিন আরাম করে নিশ্চিন্ত মনে। মেটে দাওয়ায় গা এলিয়ে দেয় চাঁদের আলোতে। নদীর হাওয়া শপ শপ করে বয়ে যায়। যায় নিশাচর দিবাচর পাখিরা ডেকে। নিজ নিজ চৌহদ্দিতে যে যার মনের মত করে আম কাঁঠালের চারা পুঁতে দেয় মাটি কেটে আল বেঁধে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, নয়ত বেগার দেয়—স্ফূর্তি করে লঙ্কা রসুন ও পেয়াজ দিয়ে 'ছালুন ভাতি' খেয়ে। কাশেম একটা বেল

ফুলের চারা এনে পুঁতে রাখে ঘরের পিছনে। অমনি অনেক গাছ সে দেখেছে ফুলমনদের বাড়ির গোরস্থানে। ফুল ছিঁড়ে সে পরত তার খোঁপায়।

ফুলমনও কি বসে থাকতে পারে। সেও দেখতে দেখতে এই মেছোর সংসারে আবার জড়িয়ে পড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে। হাঁস হয়েছে কুড়ি দেড়েক, মুরগী হয়েছে গণ্ডা ছয়েক। এগুলোর দেখাশুনা করা, রান্নাবান্না করা, সময়ে জাল বোনা, শীতের জন্য কাঁথা সেলাই করা—এ সব করতে কি আর সংসারী কাজ ফুরায়। যদিও সাহায্য করে আঞ্জু, তাতে কি হয়? একটা গড়া সংসারেরই কাজ শেষ হতে চায় না—সে অভিজ্ঞতা ফুলমনের যথেষ্ট আছে—আর এ তো নতুন পত্তন। শুধু হাত-পায়ে যেন একপাল যাযাবর এসেছিল চরে—এখন বনিয়াদ গড়তে চাচ্ছে কায়েমী।

আঞ্জু শুধু ধৈর্য ধরে শত্রুশিবিরে অপেক্ষা করে।

১৯

এর পর কয়েকটা বছর গড়িয়ে যায় :

নতুন উর্বর মাটিতে চারাগাছগুলো বড় হয়েছে। দু একটা ছাড়া বেশির ভাগ গাছেই ফুল ধরে ফল হয়। আসে মৌমাছি, আসে বৌ কথা কও পাখি; ভ্রমরও ঘুরে যায় মৌ মাসে। সময়তে চখা-চখিও এসে বসে চরের শেষ সীমায়। শীতকালেই তারা আসে বেশি। ঐ সঙ্গে হয়ত পথ ভুলে আসে দু এক কুড়ি বুনো হাঁস। চর এখন আরো একটু বড় হয়ে বেড়ে এগিয়ে গেছে জলের দিকে, পলি মাটির স্তর ধীরে ধীরে থিতিয়ে শক্ত হচ্ছে—'চোরা কাদার' ভয় এখন আর নেই কোনখানে। শক্ত পাড়ে জন্মাচ্ছে শক্ত গাছ—শিশু অরণ্যের আভাস দেখা যায় মাটির বুকে।

আঞ্জুমানকে নিকা করতে চেয়েছিল এপার-ওপারের অনেক যোয়ান মরদ। আঞ্জুমান সকলকে ফিরিয়ে দিয়েছে ঝাঁটা দেখিয়ে। কিসের মোহে সে যেন পড়ে আছে চরের মাটি আঁকড়ে।

চরের বাসিন্দারা শুধু একটু প্রাচীন হয়েছে কিন্তু শক্তি হারায়নি বলিষ্ঠ বাহুর। তাদের সংগ্রামশীল জীবন ঝড়বাদলের সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্ষয় হয়েছে অনেকটা, তবু মনে হয় যেন তেমন ক্ষীণ করতে পারেনি তাদের পরমায়ু।

'গোড় বৈঠা' মারতে মারতে কাশেমের পায়ে পড়েছে শক্ত কড়া। দাঁড় টানতে টানতে হাতের থাবা হয়েছে লৌহকঠিন। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে গায়ের চামড়া হয়েছে মোষের মত। শুধু চাল এবং টাটকা মাছের লঙ্কা-রাঙা ছালুন খেয়েই এরা তুষ্ট। তুষ্ট হয় সময়েতে পানি-পান্তা খেয়েও।

গাছপালায় বেশ একটা আবরু হয়েছে প্রত্যেক বাড়িতে। মুসলমানেরা এটা চায়ও বেশি। হিন্দু বৌরা একটু নাক কোঁচকায়।

চরের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিসাবী তারা টিনের ঘর তুলেছে। যারা তা পারেনি তারা দুচার বান টিন খরিদ করেছে। তুলবে ধীরে ধীরে। কারুর হাতে দু'দশ টাকা জমেছে, কারুর বা দেনা হয়েছে কিছু।

কাশেম আছে সমান সমান। তবে তার যা দেনা আছে তার জন্য চিন্তা নেই। চরের পূর্ণ টাকাটা এখনও দিয়ে উঠতে পারেনি—দিচ্ছে লম্বা কিস্তিতে 'হেরারটা' 'দেড়' লাগছে, তবু উপায় কি?

এর মধ্যে গুটিকয়েক ঘটনা ঘটেছে—তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর। কিন্তু অস্বাভাবিক নয় এই দুরন্ত নদীর কাছে। ফুলমনের বাপের বাড়ির জমিগুলো ছিল প্রায় চরো-জমি—পদ্মার পারে। তা ভেঙে ভেঙে নদীর বাঁক সোজা হয়ে গেছে। যেখানে পাটের সবুজ অরণ্য দেখা যেত বর্ষাকালে, তিলের ফুলে ফেঁপে উঠত জমিগুলি শীতের শেষে—এখন সেখানে শুধু দেখা যায় ধূ ধূ জল—অগাধ অথৈ। একটু শিরশিরে হাওয়া এলেই স্তবকে স্তবকে কেবল ঢেউ, আর ঢেউ। সর্পিল গতিতে চলেছে পংক্তির পর পংক্তি—একের পর আর। শেষে যেন চুম্বন করছে দিকচক্রবাল। যদি আসে দমকা হাওয়া—তখন কুজ্ঝটিকা আর ফেনার সফেদ ঝালর কাতারে কাতারে দুলতে থাকে উত্তর থেকে দক্ষিণে, নয়ত পুব থেকে পশ্চিমে। ঘূর্ণি ঘোরে চরকির মত মাঝ 'রেতের আওড়ে'।

এমন সময় শুধু চর কাশেমের বাসিন্দারা নদীতে জাল পেতে রাখে। জালের দড়ি নায়ের গলুইতে বাঁধা। বাদাম দিয়ে ভেসে চলে নৌকা। কাঁপছে, আছাড় খাচ্ছে, জাল-বাঁধা গলুই—মনে হয় যেন তিনটা তিমির ছানা এগিয়ে চলছে লেজ নাচিয়ে। হালের মানুষ এখন গলুইতে গিয়ে দড়ি আগলে থাকে। হাল বলো, জান বলো, ঐ জালের দড়িই এখন সব।

ভাঙনের ভয়ে ওপারের যত মহাজনেরা দেশ ছেড়েছে। নিবারণ মকবুল কেউ নেই। তাদের চিহ্ন লোপ হতে বসেছে। পঞ্চায়েতের আশপাশেই ছিল তাদের লুপ্ত জমি। ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হচ্ছে কালের গ্রাসে। কিন্তু বেড়েছে

এপারের চর। বেড়েছে বসতি। গড়ে উঠেছে গরিব জেলে জেলেনীর জীবনের সংহতি।

ফুলমনের মা-ও রোগে শোকে মারা গেছে। ভেঙে গেছে পঞ্চাইতের 'বাহাম' (ঠাট)। আগে ফুলমন যেতে পারত না, এখন যেতে পারে। কিন্তু যাবে কার কাছে? ছোট একটা ভাই ছিল। সেও তো মরেছে কোন জন্মে।

ফুলমন এই কিছুদিন আগেও ভাবত যে তার যদি ছেলেমেয়ে হয় এবং তারা পায় মোষের মত রং, সে নিশ্চয় বিষ খেয়ে মরবে। আজকাল তা আর ভাবে না। অতএব উগ্র হলাহলের কথা এখন অবান্তর।

ফুলমন ধীরে ধীরে সংসারে মন বসিয়েছে। তালুকদারের হিসেবী মেয়ে, সে এটুকু বুঝেছে সঞ্চয় নইলে সংসারে কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। সে কাশেমের দরাজ হাত মাঝে মাঝে চেপে ধরে। 'অত দিল-দরিয়া হওয়া ভাল না।'

'ক্যান?'

'ঠেকলে কেও মুখ তুলিয়া চাইবে না। অসময়ের জন্য কিছু জমান উচিত?'

'হাতে আছে, ভাইবেরাদারগো ধার-খয়রাত দিমু না, তয় হাওলাদার হইলাম ক্যান? অসময়ে আমরা তো ঠেকি নাই—খোদা দেছেন, এমন আল্লু রহিমও কি কম করছে! না দিলে ফুলমন, কেও পায় না।'

'এখনও বোঝতে ঢের দেরি আছে—দেখছি আল্লুডাই মাথা খাইছে!'

'আমার সিথানের তলের টাকা পাঁচটা?'

'আমি জানি না।'

'চোরে নিছে বুঝি? নিউক—হুঁশিয়ার হইয়া রাইখো। বড় কষ্টের টাকা।' কাশেমের মুখে হাসি থাকলেও মনটা টন টন করে।

তবু মাস আসে, মাস যায়—বছর আসে বছর কাটে। মাঝে মাঝে ঢলকের জল ফুঁপিয়ে ওঠে—ঘরের দাওয়া চোঁয়—সাপ-খোপ আশ্রয় নেয় পরম শত্রু মানুষের ঘরে। খাল-কূল চরো জমি থৈ থৈ করে। মনে হয় সারা দুনিয়া বুঝি ভেসে গেছে সমুদ্রের বানে।

কাশেম সুন্দর উঁচু পাটাতন তৈরি করেছে নতুন ঘরের। ফুলমন আছে দিব্যি আরামে। শুধু একটু দুর্গন্ধ আসে শুঁটকি মাছের। শীতকালের মাছ এখনও এবার বিক্রি হয়নি। ঠেলেও তুলে দিতে পারে না চালানী নায়ে। 'কাটারুরা' বাকিতে খরিদ করতে চায়। তা কাশেম দেবে না দুসন থাকলেও। গঞ্জে অনেক টাকা বাকি আছে সুতোর গদিতে। এই মাছই নাকি ভরসা।

কিছুদিন পরের কথা।

'শর' এসেছে মাঝ রাত্রে। কেউ জেগে নেই। কাশেম নদীর শব্দে জেগে ওঠে, কেউকে না ডেকে সে অন্ধকারেই চলে খাল পারের দিকে। নৌকা তিনখানা ভাল করে 'পারা' দেওয়া নেই। হয়ত কোনটা ভেসেই গেছে। সপ্‌, সপ্‌ করে শরের জল বেড়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। ঐ নৌকা হলো কাশেমের প্রাণ—প্রাণ চরের সব জেলে জেলেনীদের।

দুখানা নৌকা ঠিক আছে। কিন্তু বাকিখানা? কাশেম খুঁজতে যাবে। কি বিদঘুটে অন্ধকার! তাতে বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপিয়ে। নৌকার কাছি ছিঁড়েছে। যে দুখানা ঘাটে ছিল সে দুখানা অতিকষ্টে ভাল করে 'পারা' দেয় কাশেম। জল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে। সে একবার হাফেজকে ডাকে, কিন্তু সাড়া নেই। জলের তোড়ে দাঁড়ান যায় না খালপারে।

এমন সময় একটা মশাল নিয়ে বের হয় আঞ্জু। সে যেন কান পেতে ছিল।

'হাওলদার চলেন?'

'কই?'

'নাও খোঁজতে?'

'একলা যাইবেন? তবে যান—মশালডা চান ক্যান?' মশালডা জলে ডোবাতে যায় আঞ্জু।

কাশেম তার হাত চেপে ধরে। 'পথ যে অন্ধকার।'

'তয় আউগান।'

যদি সে একান্ত আসে—আসুক। কাশেমের তর্কাতর্কি করার সময় নেই। তার কাছে নৌকা থেকে মুল্যবান নয় আঞ্জু।

মশালের আলোতে অল্পক্ষণ খোঁজার পরই নৌকাখানা খালের ও-মাথায় পাওয়া যায়। একটা গাছের নীচু ডালে আটকে রয়েছে। নৌকা তো নয় যেন তেলের বাটি, এমন পরিপাটি পরিচ্ছন্ন ওর গড়ন। এতদিন গেছে তবু ঠিক নতুনটি আছে।

একা টেনে নিয়ে আসতে গলদঘর্ম হয়ে যায় কাশেম। হাওয়ার দাপটে একবার মশালটা নিবতে চায়—আবার দপদপিয়ে জলে ওঠে। টানতে টানতে নৌকা নিয়ে ঘাটে আসে। কাশেম শক্ত করে 'পারা' দেয় একটা গাছের সঙ্গে। গলুইতে যেটুকু কাদা লেগেছিল তা ধুয়ে ফেলে ঘসে ঘসে।

'হাওলদার তামাক খাইয়া যান। বড় পরিশ্রম হইছে।'

কথা সত্য। কাশেম আঞ্জুর ঘরে ওঠে। আঞ্জু একখানা যেমন তেমন কাপড় দেয়—তবে পরিষ্কার। ঝাঁপ বন্ধ করে হাওয়ার জ্বালায়। বাইরে বৃষ্টি আসে জোরে। সৃষ্টি যাবে বুঝি রসাতলে।

তামাক খেতে খেতে শরীরের শীত ছেড়ে যায়। কাশেমের কেমন যেন নেশা লাগে আঞ্জুমানের দিকে চেয়ে। আঞ্জুমান আস্তে আস্তে বলে, 'বৃষ্টি কইমা আইছে, ঘরে ফিইরা যান হাওলদার। অন্যের জিনিস আমি চুরি কইরা লইতে চাই না।' কিন্তু সে নিজেই কাছে সরে এসে বসে। গোটা দুয়েক কি যেন পড়ে কাশেমের গায়ের ওপর। সে হাত দিয়ে তুলে দেখে, এ তার সেই ঝাড়ের বেলফুল! যে বেলফুল একদিনও খোঁপায় পরেনি ফুলমন।

তারপর বেশি কথাবার্তা হয় না। আঞ্জু শুধু ছল ছল করে উঠতে থাকে ডাকিনী বর্ষার নদীর মত। পাড় ভেঙে যেন গ্রাস করবে মত্ত মাতঙ্গকে! বাইরে চলতে থাকে ঝড়।

ভিতরেও।

এতদিন পরে বাঁদী বাধ্য করেছে বাদশাকে!

'......খোদা, একি করলা?' ভাবতে ভাবতে ঝাঁপ খুলে পালিয়ে যায় কাশেম।

দু দিন বাদে কমে যায় শরের জল কিন্তু কতকগুলো মেটে ঘর পড়ে ভেঙে যায়।

ঘর ভেঙেছে তাতে মন ভাঙেনি কারুর। ওরা হাতে হাতে আবার ঘর তোলে। সমবেত চেষ্টায় তারা এবার আরও সুদৃঢ় করবে ভিত্তি-বেড়া-ছাউনী। দুদিন কাজ কামাই যাবে যাক। অত স্বার্থের হিসাব-নিকাশ ওরা করে না। করে না কেবল নিজের সুখের খতিয়ান রচনা।

খালের এপারে আম্র কুঞ্জের আড়ালে উঠেছে একখানা টিনের মসজিদ, ওপারে রয়েছে হিন্দু ভাইদের মণ্ডপ। এপারে রাত থাকতে যখন আজান দেয়, ওপারে তখন রজনী ও রসময় শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করে উঠে পড়ে। স্নান করে এসে তারাও মণ্ডপ সাজায়। ভোরের মিঠা হাওয়া আরও মধুর হয়ে ওঠে শঙ্খের ধ্বনিতে।

রজনী গান ধরে ভোরের ভজন। ভজন আর আজানের সুর মিশে এক মধুর ঐকতানের সৃষ্টি হয়।

মুসলমানরা ঠিক অর্থ বোঝে না তবু অব্যক্ত এক রসধারায় তারা যেন স্নান করে ওঠে—আর জেলেরা আজানের একটানা সুরে একটা মাধুর্য অনুভব করে।

কাশেম ভাবে তার নতুন চর ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠছে। গড়ে উঠছে জীবন হালদারের উপদেশ মত। এখন একবার যদি তার সাক্ষাৎ পায়, তবে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। এসব দেখলে কত যে আনন্দ পাবে বুড়ো হালদার!

২০

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে আর একটা স্মরণীয় স্থায়ী অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল এদেশে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত জনজীবনের নদীর খাদের তলে দুর্ভিক্ষ বেঁচে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং বৈজ্ঞানিক শোষণ চলত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

দুর্ভিক্ষ ঘুরত ছদ্মবেশে। নানা দেশে নানা দরিদ্র সমাজে দেখা দিত নানা রূপে। শান্তশ্রী বাঙলার পল্লী অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রকট হতো বেকারী রূপে। কখন বা তার আংশিক রুদ্রমূর্তি উলঙ্গ হয়ে পড়ত বন্যা ও প্লাবন পীড়িত দেশে। শস্য কি নেই—আছে। রুদ্ধ রয়েছে বণিকের লৌহ পেটিকায়, খুলতে হবে সোনার চাবিকাঠি দিয়ে। যে পারবে না, সে মরবে—অথবা অন্নসত্রে ঘুরে ঘুরে খাবে—অনুগৃহীত পথচারী কুকুরের মত। এসব দেখে খুশী শাসকেরা, গর্বিত বণিক ব্যবসায়ী। তারা দেশের এবং নিরন্ন দশের জন্য কি না করেছে!

এর ভিতরই দিন কাটত। হয়ত জীবন কেটে যেত এই চরের মৎস্যজীবীদের আর পরম নিশ্চিন্ত ভক্ত রসময়ের। সারা দিনের জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে ঘরে ফিরে যেত। যে ঘরে চর-বধূরা প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষায় আছে। অভাব থাক, অভিযোগ থাক—তবু একটা শান্তি আছে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে। সেই শান্তিটুকুকেই আশ্রয় করে এই নির্বোধ যোয়ানেরা বেশ ছিল।

এমন সময় যুদ্ধ বাধে পাশ্চাত্য মহাদেশে—সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। পুঁজিতে পুঁজিতে স্বার্থের লড়াই।

হাটে বাজারে গঞ্জে বড় একটা চরকাশেমের বাসিন্দারা মাছ বেচতে চায় না। নদীতেই পাইকার থাকে। তাদের নায়ে এরা মাছ তুলে দেয়। তাদের মুখেই

নিত্য নতুন সংবাদ শোনে। যুদ্ধ নাকি এগিয়ে আসছে এদেশে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ চলে কেন? আকাশ পথে নাকি পাহারা দিয়ে ফেরে। পাইকারদের মুখেই নানারকম বোমা, বারুদ, মাইন, কামান, ডুবো জাহাজের গল্প শোনে। কখনও তারা ভয় দেখায়, কখনও আশ্চর্য করে ছাড়ে। চেষ্টা করে ঐ ফাঁকে মাছের দাম কম দিতে তা পারে না। পূর্বের হারই বজায় রাখতে হয়।

ছোট খাটো হাটবাজারে গিয়েও ওরা বুঝতে পারে যে জিনিস পত্রের দাম দিন দিন লাফিয়ে চলছে। কিন্তু সে অনুপাতে তো মাছের দাম বাড়ছে না। ওদের সন্দেহ হয়।

একদিন ওরা কষ্ট করে দু বাঁক নদীর উত্তরে উঠে মাছ বেচে আসে এক গঞ্জে—নতুন পাইকারের কাছে। অন্যান্য 'নেয়েরা' যে দামে মাছ ছাড়ে সেই দামে ওরাও ছাড়ে। এ যে দ্বিগুণ টাকা! এ হল কবে থেকে?

অন্য 'নেয়েরা' ব্যঙ্গ করে জবাব দেয়, 'তোমার বিয়ার পর থিকা কাশেম।'

কাশেম জবাব দেয়, 'আরে ভাই আমরা দূরে থাকি—তেলী পাড়ার বাঁকে। সব সময় সব খবর তো পাই না।'

'আমরা থাকি কাজলার বাঁকে—সে আরও দূর।'

কাশেম জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা ভাই যুদ্ধ আমগো হাশে আইবে নাকি?'

'এমন আহম্মক তো দেখি নাই। ঐ যে জাহাজ বোঝাই সব অস্তর-পাতি যায়, মটর গাড়ি যায়, সিপাই পাহারা দেয় গাঙে, তা দেখো না? ছোটো ছোট জল-বোট হামেসা ছুটাছুটি করে ক্যান্?'

তখনই একখানা আসামগামী প্রকাণ্ড ডেস্‌প্যাচ্ ষ্টীমার আসে। কূলের কাছের নৌকাগুলোকে মাতিয়ে তোলে। ঢেউ কি আর থামতে চায়!

চরকাশেমের বাসিন্দারা চেয়ে দেখে যে জাহাজের ভিতর তাজ্জব ব্যাপার। ওরা জীবনে দেখেনি এমন সব জিনিস বোঝাই। পুরান 'নেয়েরা'ও সব কিছু চেনে না। তবে এসব যে মানুষ যুদ্ধের তাগিদে—মানুষ মারতে সৃষ্টি করেছে তা বোঝে এবং বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

তারপর ওরা বন্দরে ওঠে। দোকানে দোকানে এখানে ওখানে দু' একটা গুদামে চক্কর দিয়ে নতুন একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য নাও খোলে। কিছু সুতো কিনে রাখতে হবে, নইলে সুতো পাওয়া হবে কঠিন। তার সঙ্গে কিছু কিছু ধান চালও খরিদ করা উচিত। চালের দরটা যেন একটু চড়া ঠেকল সকলের কানে।

একদিন সকলে প্রস্তুত হয়। দোকানের বাকি বকেয়া সব চুকিয়ে দিয়ে একটু বেশি পরিমাণে সুতো আনবে। বছর ভরে আর গঞ্জে যাবে না।

কাশেমের হাতে সব টাকা নেই। সে ধার করে রসময়ের কাছ থেকে পনর। এবার হয় একশ পাঁচ। হাফেজ এবং হিন্দু কৈবর্তরা সংগ্রহ করে দেয় শ' দেড়েক। আর কয়েকটা টাকা চাই। পৌনে তিনশ না হলে দেনা মিটবে না এবং কিছু কি নগদ না দিয়ে ধারের কথা বলা চলে? সমস্ত চরের মেয়েদের তহবিল জড়ো করা হয় খোসামুদী করে। সে অতি সামান্যই। এখনো গোটা পনর বাকি।

এবার ফুলমনের কাছে হাত পাতে কাশেম। সে একেবারে না করে বসে।

কাশেম আশ্চর্য হয়ে যায়। 'কও কি ফুলমন?'

'কই ভালই—আমার হাতে কিছু নাই।'

'চরের পত্তইনা বৌরা পর্যন্ত দিল, আর তুমি কিনা শক্ত হইলা।'

'না থাকলে করুম কি?'

ফুলমন হাসে। কিন্তু কাশেম ব্যথিত হয়ে ফিরে যায়। বাকি টাকা কটা সংগ্রহ করতেই হবে তাকে।

চর ফুলমনের ভাল লেগেছিল। চরকে কেন্দ্রে রেখে তার আশা ছিল সম্রাজ্ঞী হওয়ার। কিন্তু কাশেমকে লোকে যতই হাওলাদার—তালুকদার বলুক না কেন, ও চায় সুখে দুঃখে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে দিন গুজরাণ করতে। ফুলমনের তা ভাল লাগে না। তাই সে কাশমকে নির্বোধ বলে ঠাহর করেছে। এবং সেই জন্যই সে হাত ছাড়া করতে চায়নি গুপ্ত সঞ্চয়। আপদে বিপদে দায়-নিদানে ঐ তো ফুলমনের ভরসা। কাশেম চলে গেলে সে ঘরের ভিটিতে টোকা দিয়ে দেখে। একটা টাকা বোঝাই ঘট অমনি সাড়া দিয়ে ওঠে। উপকথার আমেজ পায় ফুলমন। যেন আলাউদ্দিনের প্রদীপ।

গঞ্জে যেতেই মহা সমাদর করে মহাজন গদিতে বসায়। বাকি টাকা এমন কজনে এসে ঘরে দিয়ে যায়? 'কি কি সুতো চাই?'

নম্বর এবং পরিমানের কথা বুঝিয়ে বলে কাশেম। 'বছরের সওদা।'

'হাওলাদার যুদ্ধ দেখেছেন বুঝি?'

'না, না।'

'লজ্জার কি? ভালই তো।' মহাজন কর্মচারীকে ইসারা করে।

আলাদা আলাদা করে টাকা গুণে রাখে কাশেম।

বাকি টাকা উসুল দিয়ে, নগদ যা থাকে তা সামান্য। সেই অনুপাতে সুতো বের করে মহাজনের ইসারায় হুঁশিয়ার কর্মচারিটি।

'এ কি?'

'আজকাল যুদ্ধের বাজারে ধার বন্ধ করে দিয়েছি, সব নগদ নগদ।'

'আমার সাথেও? আমি আপনার পুরানা গাহেক।'

'আপনি কেন আমার বাজান এলেও ঐ এক কথা। ভয় কি আবার আসবেন, আবার নিয়ে যাবেন—সুতো জুতো ছাই পাশের দাম চড়বে না।'

প্রথম রাগ, শেষে কাকুতি মিনতি করে চরের জেলেরা। কিন্তু কোনো কাজ হয় না।

দুনিয়ার সতরঞ্চ খেলায় ভাগ্যের পাশা উল্টায়। এখন থেকে পয়সা দিয়ে হাত জোড় করে থাকতে হবে ক্রেতাকে—অর্থাৎ জনসাধারণকে।

বনিকই তো সত্যিকারের মালিক!

বড় অপদস্ত হয়ে সবাই বাড়ি ফেরে। নদী পথে আবার এই প্রথম তাদের নাও জলবোট থামায়। দু তিনবার সৈন্যরা নৌকায় এসে কি যেন উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে যায়। টর্চের আলোতে ঝকমক করে ওঠে সাজান গোছান গাবের বার্নিশ করা খোল। সন্দেহের কি আছে? সৈন্যরা নেমে যায়। নেয়েরা ভাবে এ এক সাহেবী খেয়াল। কিন্তু মনে মনে শংকিত হয় সবাই।

ঘাটে এসে কাশেম নৌকা তিনখানা ভাল করে 'পারা' দেয়। আজ কেন যেন কি এক অব্যক্ত আশংকায় তার শরীরটা দুর্বল বোধ হচ্ছে। সে এক ছিলিম তামাক সেজে টানতে বসে গলুইতে।

এমন করে যে মহাজন ফাঁকি দেবে, সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেবে তা যদি ঘুর্ণাক্ষরেও আগে সে বুঝত! গঞ্জে বসে যেমন চালের দাম শুনে এসেছে, উচিত্ ছিল কিছু চাল খরিদ করে রাখা। তরতর করে যদি চড়তে চড়তে চূড়ায় উঠে যায়? তা হলে তাদের মাছের দামও কি বাড়বে না? চাল জমিয়ে না রাখতে পারে, রোজ তো কিনে খেতে পারবে। ঝড় দুর্দিনের সাথী নৌকা-গুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে সে বুকে শক্তি সঞ্চয় করে। নৌকাগুলোও যেন তার কানে কানে বলে: আমরা থাকতে তোমার ভাবনা কি কাশেম?

কাশেম নৌকা তিনখানার মসৃণ গলুইতে বসে সস্নেহে হাত বুলায়। আ: কি ভাল লাগে!

পরের দিন সকলকে ডেকে নিয়মিত সময়ের আগেই আবার মেরামত করে। রঙের ওপর রঙ চড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের মত হয় ততক্ষণ কাশেম থামে না।

সকলে বলে, 'হাওলাদার কি বিয়ার কন্যা সাজায় ?'

২১

পাশ্চাত্যের যুদ্ধে দেখতে দেখতে প্রাচ্যও জড়িয়ে পড়ে। রাতারাতি কে যেন প্রত্যাহার করে নেয় সৎ ও মহতের ইস্তাহার। রণডংকায় ঘা পড়ে মুহুর্মুহু। কেঁপে ওঠে ভারতবর্ষজোড়া ইংরেজের এতদিনের তক্ত-তাউস, ভিতরে বাইরে তাহার শত্রু। বাঙলায় গণজাগরণ, আসাম সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজীর কম্বু কণ্ঠ। বহু মত পথ ও নেতৃত্বের প্রাণ-চাঞ্চল্য, হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য অনেক নয়া আওয়াজ, অনেক নয়া লড়াই।

আসে স্বাধীনতা, আসে বুঝি বহু ঈপ্সিত মুক্তি! তাই বুঝি মালা চন্দন নিয়ে সজাগ হয়ে রয়েছে মণিপুর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত মেয়েরা। অক্ষম আক্রোশে লেজ গুটাতে থাকে ইংরেজ সিংহ। আসাম এবং বাঙলা এখুনি যাবে, তাই রণনীতি বদলায়।

তাই তারা আঘাত হানে সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র এই বাঙলা দেশে। অনুসৃত হয় পোড়া-মাটির নীতি। দেখতে দেখতে জাহাজ বোঝাই হয়ে চাল উধাও হতে থাকে। হাটে বাজারে পল্লীতে পল্লীতে শুধু চালের কথা, খাদ্যের হাহাকার। এখনই এই? বর্ষাকালে এবার না জানি কি হবে! বিশেষ করে এ অঞ্চলে বড় একটা ধান জন্মে না। তাই হাহাকার জাগে সর্বত্র এবং তা দ্রুত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ক্ষীণ হয়ে আসে পল্লীর কৃষাণ কৃষাণীর কণ্ঠ। এখানে ওখানে যখন বেণে মুদীরা গোলা বাঁধে—তারা তখন গাঁয়ের নিরালা কোণে বসে কাঁদে, ককায়, তারপর হয় দেশ ছাড়ে, নয়ত ঘরে বসে মরে।......

মড়া ফেলার লোকও নেই।

কতিপয় মানুষের দুর্নিবার লোভের মুখোস খসে পড়েছে। উদ্ঘাটিত হয়েছে তার হিংস্র পাশবিক রূপ। কে যেন জবাব দেয়, 'আমি যে এসেছি মন্বন্তর! দৈবের দুর্ভোগ নয়—মানুষের সৃষ্টি।'

চালের বাজার ত্রিশ। চরের বাসিন্দারা টায়-টায় চালিয়ে যাচ্ছে। যখন একটু অসুবিধা হচ্ছে দ্বিগুণ পরিশ্রম করছে। কাশেমের তেমন কষ্ট হত না, কিন্তু তার ঘাড়ে রসময়ের সংসার এবং আঙ্গু।

আজকাল কারণে অকারণে ফুলমন আঙ্গুর সঙ্গে যখন তখন খিচমিচ করে। ফুলমন গর্ভবতী।

কাশেম বলে, 'ও সব কথায় কান দিও না আঙ্গু।'

সে তেমন কান দেয় না কিন্তু যখন দেয় তখন সতীনের মত ফুলমনকে নাজেহাল করে ছাড়ে। হাজার হলেও আঙ্গু যে সব কটুক্তি করতে পারে তা ফুলমন কখনো শোনেনি।

কেরোসিনের অভাবে মাঝে মাঝে চরের বেশির ভাগ বাসিন্দারা অন্ধকারেই রাঁধে বাড়ে। কিছু দেখার প্রয়োজন নেই, পাতে ভাত থাকলেই হলো। নিকটে দু এক মাইলের মধ্যে গ্রাম নেই, তাই একটু সুস্থ আছে। কোনও গঞ্জে বসে তো ভাত রাঁধার উপায় নেই—খাওয়া তো দূরের কথা। ফেন দাও, ভাত দাও গো চারটি বলে অস্থির। সে-সব ছবি চরে বসে ওরা বৌ-ঝিদের চোখের সুমুখে যখন তুলে ধরে, বৌঝিরা শিউরে ওঠে। কেউ কেউ কানে আঙ্গুল দেয়। ও-সব শুনতে পারা যায় না।

মাঝে মাঝে বাজারে কি বন্দরে টাকা হলেও চাল মেলে না। সেদিন সকলেরই অবস্থা সঙ্গিন। শিশুদের কোনো প্রকারে প্রবোধ দিয়ে রাখে মা বাপ, নিজেরা অভুক্ত থেকে রাত কাটিয়ে দেয়।

নিত্য রসময় কাশেমের বাড়ি যায়, বলে, 'মা-গো এদিনও কাটবে, একটু নজর দিস ছেলেটার প্রতি।'

ফুলমন খেঁকিয়ে উঠবে ভাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারে না। যদিও বোঝে এ মিঠা কথা শুধু চালের জন্য, তবুও পূর্ণ স্বার্থের অন্তরালে একটা অব্যক্ত পিতৃস্নেহের রূপ দেখতে পায় ফুলমন।

কাশেম বলে, 'শোনো ভাইরা এইবার জোর খাটুনি—জাল পাতুম ভাটা জোয়ারে।' কাশেমের হাতের টানে একটা দাঁড়ের 'কোড়া' ছিঁড়ে যায়। সে ছিটকে চিৎ হয় পড়ে নায়ের গলুইতে।

'ভাল কথা কইলা—কিন্তু জাল যে পচা, সূতা কই, সারুম কি দিয়া ?

'প্রতি ক্ষেপে চাউলের সাথে কিছু সূতাও কিনুম।'

'একটাই হয় না।'

'তাই তো মেহনৎ করতে হইবে ডুনা (ডবল) ।'

'হুঁ—কইলজা শুকাইয়া গেল—এখন মরা লাগবে না খাইয়া। উনা (অল্প) খাইয়া খাটে কিসের জোরে। আমি পারুম না।'

'পারা লাগবে—নাইলে ঠেলা মাইরা ফেইলা দিমু গাঙে।'

মানুষটা রুখে ওঠে রক্ত চক্ষু করে। 'কি কইলা? আমি কি তোমার গোলাম?'

'কেডা কইল? নায় ওঠছ নায়ের গোলাম, ঘরে যাও ঘরের গোলাম, না খাইটা খাইবা কি—আমার অষ্টরম্ভাডি?'

'মুখ সামলাইয়া কথা কও।'

'হক কথা—তা আবার সামলামু কি?'

'আরে থামো থামো হাওলাদার—চুপ করো ইদ্রিস। কুলে উইঠা ঝগড়া কইরো।'

কেউ থামে না। ইদ্রিস বলে, 'প্যাট ভরবে না কেবলি খাটো—যেন মাথাডা বিকাইয়া দিছি ওনার কাছে।'

কাশেম ইদ্রিসের এ অযৌক্তিক রাগের হেতু খুঁজে পায় না। 'তয় তোমার এ ভাল না লাগলে যেদিক খুশি যাইতে পারো!'

'সত্য?'

'হয় মিঞা সত্য।'

'সত্য?'

'হয়, হয়।'

ইদ্রিস সহসা গামছাখানা ভাল করে কোমরে জড়িয়ে প্রায় মাঝ নদীতেই লাফিয়ে পড়ে।

'চললাম মিঞা, ওপার গঞ্জে গিয়া মজুর খাটুম—রোজ নগদ পাঁচ টাকা।'

কিন্তু ইদ্রিস ফেরে না। তার বৌটাও হয় কাশেমের গলগ্রহ।

কেবল খাইয়ে পরিয়ে উদ্ধার নেই। বৌটা হাহাকার করে। অভিশাপ দেয়, অনুযোগ করে ফুলমনকে। 'তোমার স্বোয়ামী ঠেইলা ফেলাইয়া দেছে মিঞারে গাঙে। আমি সব শুনছি। খোদার গজব এড়াবা ক্যামনে?'

তর্কা-তর্কি করে লাভ নেই। কাশেম এত কাজের চাপের মধ্যেও গঞ্জে যায়। কারণ এই বৌটাই তার এত দিনের চরের সুনাম নষ্ট করবে। হাওলাদার হওয়ার কি জ্বালা! চুপচাপ সব বুঝে-সুঝে কিল খাও।

এক চায়ের দোকানী পরিচিত ছিল করিমখালি গঞ্জে। কাশেম তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়।

'ইদ্রিসেরে দেখছেন ?'

'এই গাইঠা-গুইঠা যোয়ান ?'

'হয়—বাবড়ি আছে বাবুর।'

'এট্টু চা খাইবেন না—নাস্তা করেন বিলাতি রুটি-পিঠা দিয়া ? চা কিন্তু গুড়ের দাম দশ পয়সা। রুটি-পিঠা আষ্ট আনা।'

এতগুলো পয়সা জলে যাবে ? কাশেম একবার ভাবে নিষেধ করা উচিত আবার চিন্তা করে দেখে তা হলে কাজ হাসিল হবে না।

'দু পয়সার চা দশ পয়সা হইছে ?

'সবুর করেন মিঞা দশ টাকা হইবে। কোন্ স্থাশে যেন মিঞা আলুডা টাকা বিকাইছে। এই তো ফর্‌রার (ওঠা-নামার) বাজার, ব্যব্‌সাইতের (কারবারীর) মজা। ঘর দুয়ার কি টিনের উঠাইছেন ?'

'আগে যা করছি, এখন পারি নাই। আপনে ?'

'এই তো দোকান। চাউল খরিদ কইর‍্যাই চর্‌কি-বাজি দেখি চৌক্ষে। আমাগো হইবে টিনের ঘর—গুজা শুইবে চিৎ হইয়া ? ছোঃ !'

'তয় যে আমারে কন ?'

'দেখেন গিয়া মহাজন পট্টি। কেমন সব নয়া ঘর।'

'এখন ইদ্রিসের খবরডা কন ?'

'জাল ওষুধ বেচতে পারবেন, চোরা গোপ্তা কেরাসিনের টিন ? আপনার তো নাও আছে, ভয় কি ? শত খানেক টাকা চালান। শ-তে হাজার, হাজারে লাখ। যা খুশি বাখরা দিলেই আমি রাজি।'

কাশেম নিবিষ্ট মনে শোনে। বোঝে যে দুনিয়াটার হঠাৎ রঙ পাল্টে গেছে। একেই বলে কালো-বাজার।

'কি জবাব বন্ধ হইল যে মিঞার ? খোয়াব (স্বপ্ন) দেখেন নাকি ?'

'ও আমার ধাতে সইবে না ছাহেব।'

কাশেমের ভাগ্যে জলো চা ও বাসি রুটি জোটে। উপায় নেই প্রত্যাখ্যান করার।

তারপর ওঠে ইদ্রিসের কথা। সংক্ষিপ্ত।

কদিন কাজ পায় না। কুকুরের মত এখানে ওখানে ঘোরে। নবাগতের

পক্ষে অন্ধি-সন্ধি খুঁজে বার করা কঠিন। অবশেষে এক দালালের প্রলোভনে পড়ে সৈন্য বিভাগে নাম লেখায়, বণ্ডে দেয় টিপ সই।

'তারপর?' কাশেমের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে।

'যাওয়ার সময় আপনাগো সেলাম জানাইতে কইছে—চা খাইয়া গেছে কাইন্দা কাইটা। মাপ চাইছে ঝগড়া করছে বইলা।'

কাশেম পয়সা দিয়ে উঠে পড়ে। অর্ধেক রুটিখানা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় একটি অর্ধ উলংগিনী বছর পনরর মেয়ে।

চরে ফিরে ইদ্রিসের বৌকে মিথ্যা প্রবোধ দেয়। আর করবে কি কাশেম!

দিন দিন তার পক্ষে আয়-ব্যয় কুলান কঠিন হয়ে ওঠে। সময় সময় দু এক বেলা ভাতে টান পড়ে।

কেউ কারুর প্রতি অভিযোগ করতে সাহস পায় না।

ঘোর শংকায় মৌন হয়ে যেন বলির ছাগের মত অপেক্ষা করে। ব্যক্তিগত হিংসা দ্বেষের কথা ভুলে সময় সময় যেন একীভূত হয়ে যায় ওদের অনুভূতি।

কিন্তু ফুলমন ওর ভিতরই দু একটি পয়সা, দু একটি সিকি, কিংবা আধুলি সঞ্চয় করে।

কাশেম টের পায়—ফুলমন স্বীকার করে না। তাই সংঘর্ষ হয় মাঝে মাঝে।

ফুলমন কাঁদে। এখন আর কাশেম পূর্বের মত অধীর হয় না। তার মগজ বোঝাই দুশ্চিন্তা। চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

আঞ্জু এবং কাশেম পরস্পরকে দেখলে এড়িয়ে যায়। কোনো কথা বলে না।

দিন কাটে ভাঙনের চির-খাওয়া পাড়ে দাঁড়িয়ে। তবু কাশেম হতাশ হয় না। এদিন ওদের কাটিয়ে উঠতে হবেই হবে। ও নিত্য নতুন পরিকল্পনা করে কৌশলী নেতার মত। রসময় ও চরের জেলেরা অনুমোদন করে যায়।

অভাবের ঢলের মধ্যেও ফুলমনের দেহে অপূর্ব এক রূপের ঢল নামে। কাশেম মুহূর্তের জন্য হয়ত সে দিকে চেয়ে দেখে কিন্তু তা তার মনে গভীর দাগ কাটে না।

একদিন ফুলমন বলে, 'কাপড় কিনবা না? পানি গামছাখানাও যে ছিঁইড়া গেছে তোমার।'

'কইলা ভাল!'

কাশেম গিয়ে নায়ে ওঠে। বড় নদীর মাঝ বরাবর এসে জাল ছাড়তে থাকে সকলে একত্র হয়ে। গাবে টনটনে পর্বত প্রমাণ জাল। ধরতে

ছানতে টানতে এখনো কী যে ভাল লাগে। মানুষের প্রিয় জিনিস থাকে বোধ হয় অনেক। কাশেমেরও তা রয়েছে। কিন্তু প্রিয়তম সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয় এই জিনিসটি—যখন নায়ের বুকে প্রাগৈতিহাসিক কাল কেউটের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

'হাওলাদার জাল এক কাছি ছেঁড়ল ক্যামনে?'

বলে কি নেয়েরা! চকিতে চেয়ে দেখে কাশেম চিৎকার করে ওঠে।

'সর্বনাশ সুতা আনো, সুতা আনো জল্‌দি।'

স্রোতের গতি মুখে জাল নামছে দুরন্ত তেজে। এখন রোকা যাবে না। সুতো দিয়ে জুড়ে না দিলে হয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে বড় অংশটা।

ছৈর ভিতর থেকে ফিরে এসে একজন বলে, 'সুতা নাই একরত্তিও।'

'ভাতের বদলে বুঝি সব খাইছ। আমার মাথাডা খাইলেই পারতা? হালে ঢিল দেও ওসমান—পালের বাতাস কমাও গণি—ব্রজবাসী আমার কাছে আইসো ভাই।'

সকলে বিভ্রান্ত হয়ে থতমত করতে থাকে।

কাশেম উলংগ হয়। অবলীলাক্রমে তার শেষ পরিধেয় বস্ত্রখানা ফালি ফালি করে ছেঁড়ে।

'এখন হাতাহাতি গিট্‌ দেও।'

ওরা অতি অল্প সময়ের ভিতরই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে সৈনিকের মত কাজ করতে থাকে। কিন্তু নরম জাল হাতের চাপ ও স্রোতের ধাক্কায় মাঝে মাঝে খাবলা খাবলা ছিঁড়ে যায়।

গভীর রাত্রি।

একখানা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে কাশেম নাও থেকে ঘরে ফেরে। ফুলমন সুষুপ্ত। কাশেম তাকে ডাকে না। আঞ্জুকেও সজাগ করে না। ক্ষুধায় পেট পুড়ে যাচ্ছে—তবু যে খেতে চাইবে এ সাহস তার নেই। এবার ছেঁড়া জাল দিয়ে ওরা সুবিধা করতে পারেনি। খেয়ে-খরচে সামান্যই বেচেছে।

ক্লান্ত কাশেম আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর বেলা ফুলমনের ঘুম ভাঙে আগে। সে কাশেমকে দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকে। শাড়ি বদল হয়ে গেল নাকি? কিন্তু না—ফুলমনের পরনের খানা তো ঠিকই আছে। হয়ত ভিজা কাপড় পরে এসেছিল হাওলাদার।

সে খোঁজ নিতে গিয়ে সমস্ত কথাই জানতে পারে। তখন দু একজন নেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে। আসলে অনেকের চোখে নিদ্রাই আসেনি। কতক্ষণ আর মিছামিছি শুয়ে থাকা যায়।

ওরা একে একে এসে কাশেমের দাওয়ায় জড়ো হয়। আবার বৈঠক বসে সমস্যা-জটিল। সকলের ভাগ্য যে জালের সঙ্গে জড়িত, সেই জাল সুবৃহৎ এক জীয়ন্ত জীবের মত দুর্ভিক্ষের কথা মানছে না—চাইছে রসদ। মহার্ঘ সুতো। যারা রসদ জোগাবে তারাও তো উপোসী।

কিছু অর্থ আছে গত ক্ষেপের। কিন্তু তা দিয়ে কোন্ তরফের চাহিদাটা আগে মিটাবে? ভাবতে ভাবতে মাথা টনটন করে। খালি হয়ে যায় তামাকের শেষ তহবিলটুকু পর্যন্ত।

ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী—চরের সমস্ত বাসিন্দা এসে একত্র হয় ফুলমনের উঠানে।

এবার ক্ষেপ থেকে মর্দরা ফিরেছে বটে—কিন্তু হাঁক ডাক নেই কারুর কণ্ঠে। যেন ফেউ বনে গেছে সব।

কারণ চাল আসেনি চরকাশেমে—যেন প্রাণ আসেনি কারুর।

কাশেম বলে, 'কি হইবে দাস মশাই?'

রসময় কোনো জবাব দেয় না।

আবার তামাকের ডিবাটা বৃথাই ঠোকে কাশেম। বৃথাই তাকায় উপস্থিত জনতার মুখের দিকে, কেউ কোনো জবাব দিতে পারে না।

রসময় ভেবে দেখে দুএকটা কাঁঠালের কুশি এমন কি কাঁচা কলাগুলি পর্যন্ত সাবাড় হয়েছে চরের। পুরুষেরা যতক্ষণ আনবে, মেয়েরা বেচে চালিয়েছে, কোনো সম্বলই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

রসময় অনেক চিন্তার পর ফুলমনের দিকে চেয়ে বলে, 'মা লক্ষ্মী এখন উপায়? এতগুলো সন্তান যে তোর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।'

ফুলমন একটু বিরক্ত হয়। বুড়োর ফন্দিটা মন্দ নয়। একেই বলে শক্ত পরগাছা।

'আমি কি করুম, আমার হাতে কি কিছু আছে যে এতগুলা মানুষের খোরাকী জোগামু? হাওলাদার কি একটা ফুটা পয়সাও দেছে আমার হাতে কোনো কালে? মানুষের পাঁচখান গয়না থাকে'···ফুলমন আর কিছু বলতে পারে না।

'তবু কিছু করতে হবে। ক্ষিদে পেলে সন্তান কিছু শুনতে চায় না। তুমি হচ্ছ চরের মা লক্ষ্মী।'

বৃদ্ধ কুঞ্জদাস ও নিমাই মন্তব্য করে, 'যা কইছেন দাস মশায়—মা লক্ষ্মী বটেন! হাওলদার আমাগো ভাগ্যবতী।'

ফুলমন মুসলমান হলেও পূর্ববঙ্গেরই পল্লী-দুহিতা। তার মনে একটা কল্পরূপ ছিল এই ধন-জন-সৌভাগ্য-দায়িনী দেবীর। সে অভিভূত হয়ে পড়ে। নিমেষের জন্য চেয়ে দেখে প্রতিবেশী আবালবৃদ্ধবনিতার উপবাসী মুখগুলি। তাদের কোটরগত চোখগুলি বিশ্বাসের কি এক অপার্থিব দীপ্তিতে যেন ভরে উঠেছে!

ফুলমন ঘরে ঢুকে একটা ছোট্ট শাবল বার করে। ওর চরই যদি না থাকে তবে ওর এ নামের মূল্য কি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই কতকগুলি সিকি, আধুলী, এক-আনী ও দু-আনী ঝনঝন করতে থাকে। ফুলমন তার সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে।

কাশেমের মুখখানাই সবচেয়ে বেশি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ঘরে ঢুকে কাশেম দেখে যে শ্রান্ত ফুলমন নতুন রূপে উজ্জল হয়ে বসে রয়েছে।

ওরা দুর্দিনের সঙ্গে এমনি লড়াই করে চলে।

২২

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ওরা আবার হয়রান হয়ে পড়ে। সামান্য কটি টাকা—খরচ হয়ে যায় দু এক সপ্তাহের ভিতর।

আবার সর্বনাশা হাঁ মেলে আসে দুর্দিন। ওরা খাটতে খাটতে শুকিয়ে যায় তবু অভাবের গহ্বর পূর্ণ করতে পারে না। আয় যা করে তাতে কিছুতেই ব্যয় কুলায় না। চিন্তা-ভাবনায় ওরা হাবুডুবু খায়।

এক একবার ওরা নির্দিষ্ট দিনে ক্ষেপ থেকে চরকাশেমে ফেরে না। উপোস চলে ঘরে ঘরে। ছেলেমেয়েরা যদিও বা কিছু খায়, পেটে পিঠে ফোড়া যায় বয়স্কদের।

এমনি সময় একদিন ফরিদ এসে চরে ওঠে।

কোথায় তার ছেঁড়া কাপড়, ঘামে ভিজা ধুলো-কাদা মাথা শরীর? কোথায়ই বা তার রুক্ষ চুল? মাথায় দিব্যি তুর্কী ফেজ, পরনে সুন্দর দামী লুংগি।

চেহারা হয়েছে নাদুস-নুদুস। সে হাসতে হাসতে চরে এসে নাও ভেড়ায়। ঘরে গিয়ে বসে। সঙ্গের মাঝিটা দুটো বড় বড় কমলালেবুর ঝুড়ি তার কাছে এনে নামিয়ে রাখে।

চরের বাসিন্দারা সবাই ভেঙে পড়ে। স্ত্রীলোক বৃদ্ধ যুবা শিশু কেউ বাদ যায় না। সে প্রত্যেকের হাতে বড় বড় এক এক জোড়া কমলা দেয়। সকলকে আদর আপ্যায়িত করে। মানুষের কৌতূহল দমন করতে তার প্রায় একটা ঘণ্টা কেটে যায়। কত রকম প্রশ্নের যে জবাব দিতে হয় তার কি ইয়ত্তা আছে!

সে নাকি আজকাল আসামে সাহেববাড়িতে চাকরি করছে, কেমন আছে তা আর না বললেও চলে। অনেক কাল ধরে দেশে আসবে বলে ভাবছে, কিন্তু সময় কই? সাহেব তাকে ছাড়া একটি বেলাও কাজ চালাতে পারে না।

কিন্তু সে বড় দুঃখ প্রকাশ করে রহিমের মৃত্যু-সংবাদ শুনে। 'দাস মশয়, আমি চিরদিন কই নাই যে চুরি না কইরা কি সুখে থাকার উপায় আছে? তবে আইনের ফাঁক রাইখা করা লাগে। ও যদি এখানে না আইয়া আমার সাথে যাইত!'

হঠাৎ রসময়ও কেন জানি আজ ভাবে: না—তার দেবসেবা, সারাদিন বসে বসে ডালা-কুলো বোনা মিছে—মিছে এই মৎস্যজীবী চরের বাসিন্দাদের অমানুষিক পরিশ্রম। তারা সকলেই যদি ওর সঙ্গে তখন যেতো! কিন্তু পর মুহূর্তেই এ দুর্বলতা কেটে যায়।

'কাশেম কোথায় আঞ্জু?'

'ক্ষেপে (মাছ ধরতে) গেছে। সন্ধ্যাসন্ধি আইবে।'

'ক্যামন আছে ওরা?'

আঞ্জু সব কাহিনী খুলে বলে। ফরিদ এক একটা কমলার কোয়া খায় এক একটা কথা শোনে। আঞ্জুকেও গোটা কয়েক খেতে দেয়। কয়েকটা দিন ঘুরলেই যে এরা চরে হাল হালুটিও করত, নানা ফসল বুনত সে সব কথাও বলে। বলে, কি কি আশা ছিল, কি কি আশা ফলল না—আগুন লাগল দুনিয়ায়। স্বামীর কথাই তার আজ বার বার মনে পড়ে—যে লোকটির আশ্রয়ে এসে তার সারাটা জীবনই নিষ্ফল হয়ে গেছে। 'আমিও কি সুখে আছি ভাইজান?'

ফরিদ বলে যে এদের নিস্তার নেই। 'নাও-দুন' সরকার থেকে আটক করবে। এরা মরবে না খেয়ে। একটি শস্যকণাও বাংলা দেশে পাওয়া যাবে না। শুধু পাওয়া যাবে চোরা বাজারে, বিকোবে হীরার দামে।

আঞ্জু ভয়ে ভয়ে ভাইয়ের কাছে সরে আসে। 'কও কি ভাইজান—না খাইয়া মরুম ?'

ফরিদ আর কিছু বলে না।

অনেকক্ষণ আঞ্জু চুপ করে বসে থাকে। তারপর দুবার উঠে ফুলমনের কাছ যায়। ফুলমন আগ্রহ করে ফরিদের বিষয় জিজ্ঞাসা করে কিন্তু তার খাওয়ার বিষয় ভাল মন্দ কিছু বলে না। এতদিন বাদে এসেছে, উচিত ছিল তাকে নিমন্ত্রণ করা। হাজার হলেও আঞ্জুর ভাই তো!

'হাওলাদার এখনও আয় না যে আঞ্জু ?'

'কমু ক্যামনে ?'

ফুলমনের মনের ভাব আঞ্জু বুঝতে পারে।

তাই কিছুক্ষণ বাদে আঞ্জু ওখান থেকে উঠে আসে। সারাটা পাড়া খুঁজেও এক পোয়া চাল জোটাতে পারে না। কম সময় হয় ফরিদ আসেনি। এখনও ভাইয়ের জন্য দুটো ভাত সিদ্ধ বসাতে পারল না, একি শুধু তার একার লজ্জা ? সন্ধ্যা তো প্রায় হয়ে এয়েছে। হাওলাদার হয়ত এখুনিই এসে পড়বে। সে ফুলমনের কাছে না চেয়েই গোটা দুয়েক ডিম নিয়ে আসে চুপে চুপে। চাইলে হয়ত ফুলমন অস্বীকার করবে। আজকাল সে বড় শক্ত হয়েছে। আর চিরকালই সে হিসাবী মেয়ে।

সন্ধ্যা উৎরে যায়, তবু একটা লোকও ফেরে না।

ডিমের ছালুন রেঁধে আঞ্জু বসে আছে চালের আশায়।

'কিরে চুলা নিবাইলি যে ?'

আঞ্জু আর কি বলবে। তার দুর্ভাগ্য।

'আমি কেওর ভরসায় আসি নাই, এই নে, চড়া হাঁড়ি।'

'এমন চাউল পাইলা কই ? এক্কেবারে যে কান ফোড়া যায়।'

'সাহেবরা তোগো মত কি যা তা খায় ?'

'ওডা কি ?'

'পাউঠার (পাউডার)।'

'এ যে ময়দা পিডার গুঁড়ি।'

'নারে বোকা, না। গোন্ধ শুইকা দেখ।'

'এইয়া দিয়া কি করে ভাইজান ? খায় ?'

'তুই আমার নাম হাসাইবি ! মেম সাহেবরা গালে মাখে—আর মাখে আয়ারা।'

'আমরা মাখলে কি দোষ হইবে ?' আঞ্জু একটু পাউডার তুলে গালে মাখে। সুগন্ধে মনটা কেমন যেন নেচে' ওঠে। সে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌটার ওপরের ছবিগুলি দেখে। দুটি স্ত্রীলোকের ছবি। কেমন তারা হৃষ্টপুষ্ট। হাসছে মনের আনন্দে। সে আবার অন্যমনস্ক ভাবে কতটুকু পাউডার মাখে।

'এখন ভাল কইরা মুইছা ফ্যাল্।'

'ক্যান্ ? ক্যান্ ভাইজান ?'

'নাইলে বান্দরের মত দেখায়।'

আঞ্জুর দুঃখ হয় শত হলেও দামী জিনিস তো !

একে একে তিন তিনটা দিন কাটে, তবু চরের নেয়েরা ফেরে না। এদিকে যেমন চিন্তা তেমনি অন্নাভাব গাঢ় হয়ে আসে। ফুলমনের হাঁস-মুরগীগুলো সবাই মিলে ধরে ধরে খায়। আর সঙ্কোচ নেই। তবু শুধু মাংসে কি আর চলে ? হাবিজাবি শাক-পাতা-থোর-কচুও উজাড় হতে থাকে, উজাড় হয় কাঁঠালের কুশি পর্যন্ত।

একদিন রাত্রে ফরিদ বলে, 'আঞ্জু আমার কথাই ঠিক। বড় বড় নাও ধরার নুটিশ জারী হইছে। ওরা হয় ধরা পড়ছে, নয় পলাইয়া ফেরতে আছে।'

'নাও ধরবে, নাও ধরবে—তুমি আর কু-ডাক ডাইক্কো না। এডা কি মগের মুল্লুক' ?

পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে ঘটনা ঠিক। রসময় খবর পেয়েছে, ওরা নৌকা নিয়ে, আওড়ে-বাওড়ে ঘুরছে। কিন্তু অত বড় তিনখানা নাও কদিন লুকিয়ে নিয়ে ফিরবে ? সুখের সাথী, দুর্দিনের ভরসা—সে নাও যাবে ! রসময় ছটফট করতে থাকে।

আজ গ্রামের সব মেয়েরা ফুলমনের দরজায় গিয়ে বসে। কি খাবে ? কেঁদে মরছে ছেলে মেয়েরা।

ফুলমন নিজেই অসুস্থ। তাতে এই উপদ্রব, 'আমি কি দায়ে ঠেকছি নাকি ?'

দায়ে না ঠেকলেও সে বড়লোকের মেয়ে, হাওলাদারের স্ত্রী—একেবারে এড়াবে কি করে ? এখনও এরা তাকে ঠাহর করে রেখেছে বড় লোকের মেয়ে ! এমন পরিহাস কি আর আছে ? তার নিজের মাংস টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছা করে, খোদা তার নসিবে এত দুর্ভোগও লিখেছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেও তার মনটা টগবগ করে ওঠে। মনে হয় এই বিরাট চরের সমস্ত দুর্ভোগ তার মাথায় চাপিয়ে পুরুষেরা তো মরছে ডুইবা।'

'আমিই বা আর বাইচা করুম কি? আমার মাথাডা খা।'

'না-না…', ওরা মাথা চায় না। তেমন কঠিন বিদ্রোহের সুর নয়—চায় দানা। দুটো চাল কিংবা ক্ষুদ। ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ওঠে।

ফুলমন ভাবে, তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু কেন জানি তা পারে না। অতগুলো বিশুষ্ক মুখ ওর দিকে চেয়ে আছে!

ফুলমন শেষ সম্বল শুটকি মাছের বস্তা কটা বাইরে ফেলে দেয়। ঐ শুটকি মাছের ওপর যেন শকুন পরে। কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি চলতে থাকে।

আজকের দিনটা তো কাটবে।

কোথায়ও বন্যা হয়নি, অনাবৃষ্টিতে একটি গাছের পাতাও ঝলসে যায়নি। নদীর 'শরে' অথবা সমুদ্রের লোনা ঢলকে ভেসে যায়নি একটি ধানের ছোপা। যে সব দেশ থেকে সাধারণত এসব দেশে ধান চাল নায়ে করে চালান আসে—সেসব দেশে নাকি এবার ফসল ফলেছে প্রচুর। যারা শীতের সময় ধান কেটে এসেছে তারা বলেছে, এমন ফলন তারা নাকি দেখেনি দু চার বছরে। তবু তেরশ পঞ্চাশ আসে চরকাশেমের বুকে। আসে তার চারদিক জুড়ে—যেমন করে গর্জে আসে দাবানল। এ দাবানল নানা কৌশলে জ্বালিয়েছে ইংরাজ, আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে তার সহচর মুনাফা-শিকারীর দল। দেশী বর্ধিষ্ণুরা এ সময়ও কি দেশী নিরন্ন ভাইদের দিকে চেয়ে দেখবে না? নিশ্চয় দেখবে। তাই তো চাল পুঁজি হচ্ছে চোরের গোলায়, বিক্রি হচ্ছে কালো বাজারে—লাখে লাখে নোট উড়ছে দালালদের কথায়।

২৩

তারপর সাতদিন গত হয়েছে।

ঘরে ঘরে বিছানা পড়েছে। এখন উঠতে কষ্ট হচ্ছে সকলের, ছেলে-মেয়েদেরও কান্না ঝিমিয়ে এসেছে। আঞ্জু এতদিন ধরে অনেক কথা ভেবেছে, ফরিদের কাছে কি কি যেন বলবে। সুযোগ পাচ্ছে না, তাই বলা হয়নি।

'আঞ্জু আর তো আমি দেরি করতে পারি না।' ফরিদ গভীর রাত্রে আঞ্জুকে ডেকে বলে, 'তুই এক কাজ করতে পারিস?'

'কি ?'

'দু একটা মাইয়া দিতে পারিস, আমার কাম করবে—সাহেব বাড়ি খুব সুখে থাকবে। পাউঠার মাখবে, খানাপিনা সাজ-গোজ পাবে খুব ভাল ? কাশেমের বৌ ফুলমন যাবে নাকি ? কাশেম তো আইল না।'

'ভাইজান, ফুলমন মরলেও যাইবে না—তুমি ওরে চেনো না।'

'এত সুখ বুইন, কমু কি !'

'আর একজন আছে, কইয়া দেইয়া দেখতে পারি।'

'কেডা ?'

'ঐ ইদ্রিসের বৌ।'

'আরে থুথু, ঐ পেত্নী—সাহেব বাড়ির মেথরানীও ওর থিকা খাপসুরাৎ।'

'তয় ক্যামন দেখতে হওয়া চাই—এই আমার মত ?' আঙ্গুর চোখ লজ্জায় নত হয়ে আসে।

'না, না তোর কাম না—তুই সে সব পারবি ক্যান ?'

'পারুম ভাইজান, পারুম সব তকলিব (কষ্ট) সইতে। এখানে আমি কি হালে (ভাবে) আছি তা কি তুমি বড় ভাই হইয়া বোঝো না ?'

ফরিদ ফ্যাসাদে পড়ে। সে কথা ঘুরাতে চেষ্টা করে। 'আসাম যে বন জংগলের রাজ্য, বাঘ ভাল্লুকের··· !'

'তুমি হাজার কইলেও এ যাত্রা তোমার সাথে যামু।' তারপর আঙ্গু সিক্ত কণ্ঠে বলে, 'বিয়া হইছে ইস্তক দুইডা ভাল খাইয়া দেখি নাই একখান ভাল কিছু পইরা দেখি নাই—ভাইজান আমারে পায় ঠেইলো না, আমি চাকরিতে যামু।'

পরিস্থিতিটা যে এমন ঘুরে দাঁড়াবে ফরিদ তা কল্পনাই করতে পারে নি। সে বলে, 'এখন তো আর যাইতে লাগছি না, তুই ঘুমা। আমিও একটু চোখ বুজি, রাত্তির ভোর হইয়া আইল।'

আঙ্গুর চোখে ঘুম আসে না। তার দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামে। স্বামী ও সংসারের জন্য সে কম খাটেনি। সে ভেবেছিল একদিন সুদিন আসবে, পাবে শান্তির, সুখের জীবন। কিন্তু কোথায় সব হারিয়ে গেল—হারিয়ে গেল তার স্বামী, ছেলে দুটো। তারপর চেয়েছে একটু আশ্রয়, নিশ্চিত খুঁটি—হাওলাদারকে কেন্দ্র করে। হাওলাদারের উপর একটা দাবি যেন মনের তলায়

চিরদিনই তার ছিল। তাই কাশেমকে সে কামনা করেছে সর্বস্ব দিয়ে। ফুলমনকে করেছে হিংসা। কিন্তু আজ মনে হয় সে হেরে গেছে, ঠকে গেছে সব কিছুতে। ভবিষ্যৎ শুধু এখন গভীর নৈরাশ্যে ভরা, এতটুকু নিরাপত্তার চিহ্ন নেই কোনখানে, সে এবার আসাম যাবে। সে পাউডার চায় না, সাজ-সজ্জায় তার তেমন আসক্তি নেই—শুধু চায় একটু নিশ্চিন্ত জীবন। একটি দিনও তো সে নির্ভাবনায় কাটাতে পারে নি। সে তার ভাইকে এবার ছাড়বে না। আসামের জংগলে যদি কোনও মোহই না থাকবে তবে আবার ফরিদ কেন ফিরে যেতে চাইছে? আঞ্জুও যাবে। ছেলে নেই, মেয়ের দায়িত্ব নেই, স্বামী হলো নিখোঁজ, যাকে কামনা করল তাকে পেল না—সে কেন থাকবে এখানে পড়ে?

'ভাইজান সজাগ আছ?'

ফরিদের তন্দ্রা ভেঙে যায়—'কি?'

'আমি কিন্তু যামুই, টালিবালি শুনুম না।'

ফরিদ মহা বিরক্তি প্রকাশ করে, জবাব দেয়, 'হয়, হয়—এক কথা বারবার কওয়া লাগবে না।'

এর পর আঞ্জু ঘুমায়, ফরিদ কেন যেন আর চোখ বুজতে পারে না। সে একটা ব্যথায় ও শংকায় অধীর হয়ে পড়ে।

রসময় দেখে যতদিন নেয়েরা বাড়ি না ফেরে ততদিন সকল দায়িত্বই তার। সেই একমাত্র পুরুষমানুষ চরে। কিন্তু শরীর তার এমন হয়েছে যে শক্তি নেই মোটে। কোথায়ও যেতে না পারলে এই নদী-ঘেরা চরে বসে কি বোঝা যায়? আর করাই বা যায় কি?

সে লাঠিটা নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে নদীর পারে যায়। তার সংগে আঞ্জুও যায়। সে ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করে নিয়েছে। বুড়ো বলে, 'যখন এসেছিস মা, তখন হাতখানা ধর।'

নদীতে একখানাও নৌকা নেই।

রসময়ের মনে হয় যেন একখানা নৌকা পাড়ি দিয়ে এদিকে আসছে। কিন্তু দুর্বল শরীরে ভাল ঠাহর করতে পারে না। আঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করে। আঞ্জু বলে—'হুঁা, ইদিকেই আইতে আছে।'

'কতদূর মা? দেখত লক্ষ্য করে?'

'মাঝ রেতে। বড় বেসমাল ঢেউ।'

'পারবে তো এপার আসতে ? আমি তো শুধু ফেনার ঝালর দেখছি, আর শুনছি নদীর হাওয়ার ফোঁসানি।'

'ভয় নাই, পাকা মাঝি। সাত আটখান বৈঠা পড়ছে দুই কোলে।'

'ঐ তো তিন রেতের কাছাকাছি হইল।'

রসময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে : নদীতে তো তেমনি মাতন আছে, আকাশে তো তেমনি সূর্য ঝলমল করছে—এপারে ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে গাছপালার শ্যামলতা তো বদলায়নি। তবে কি হলো ? কেমন করে এ মহা মন্বন্তর এলো ? কার এ ষড়যন্ত্র ?

'তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই ?'

'দাস মশায়, আপনে দেখেন না, এই যে হাওলাদার আইছে।'

রসময়ের ঘোলা চোখ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে, 'মা, আমি তো তেমন ঠাহর পাইনে, তাইতো তোকে সংগে আসতে বারণ করিনি।'

কাশেম ওপরে উঠলে রসময় তাকে জড়িয়ে ধরে। চরের মেয়ে মহলে খবরটা জানাবে বলে আঞ্জু বাড়ির দিকে ছুটে যায়।

রসময়ের চোখের দীপ্তি খানিকটা হয়ত কমতে পারে, চরের বাসিন্দাদেরও কি চেহারা বদলায়নি ? যেন কটি কংকাল পাড়ি দিয়ে এসেছে এপার।

ওপার থেকে কার যেন একখানা ডোঙা চেয়ে নিয়ে এসেছে। ওরা নৌকা তিনখানা নিয়ে এ কদিন ঘুরে যখন বুঝল যে পুলিশ কি সৈন্য বিভাগের লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে রাখতে পারবে না, তখন কোথায় যেন কোন এক চত্‌লা খাড়িতে ডুবিয়ে রেখে এসেছে ধর্মের নামে। যদি বিধাতা কখন দিন দেয় তখন গিয়ে তুলবে। ডুবুরির দরকার হবে না, কাশেম এক নিঃশ্বাসে চল্লিশ হাত জলের তলে যেতে পারে।

জাপানীরা নাকি আসছে। তারা নৌকা পেলে অনায়াসে দেশের ভিতর ঢুকে পড়বে। তাই এমনি হাজার হাজার নৌকা ধরে আটক করা হচ্ছে এখানে ওখানে থানায় থানায়। রুজি মরছে লক্ষ লক্ষ লোকের। তাতে কি ? বাকি যারা থাকবে তারা তো বাঁচবে। সেই জাপানী শত্তুরের ভয়ে ধান চালও নাকি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে সব। এখন চালের দাম পঞ্চাশ। সেও প্রকাশ্যে কেউ বেচে না। টাকা আগাম নেয়, অনুগ্রহ করে অন্ধকারে দেয়। এরা না থাকলে নাকি দেশ একেবারে উজাড় হয়ে যেত।

নেয়েরাও নাকি এই সাতদিন প্রায় অভুক্ত।

নদীর পারে বসে আর বেশি কথাবার্তা হয় না, সকলেই বাড়ি ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব।

ফরিদের কথা শুনে কাশেম মনে মনে ঠিক করে আসে প্রথমেই ওর সঙ্গে দেখা করে সব ব্যাপারটা নিয়ে একটা আলোচনা করবে। সে বিদেশ থেকে এসেছে, হয়ত এমন একটা কিছু পথ দেখিয়ে দিতে পারবে, যে পথে গেলে অনায়াসে মিটে যেতে পারে এ সমস্যা। এমন কি তার সঙ্গে সাহেব-সুবাদের পরিচয় থাকাও আশ্চর্য নয়। আসামের জংগলেই নাকি গোরা পল্টনদের ঘাঁটি। তাদের আদেশেই নাকি এসব হচ্ছে। ফরিদ-ভাই যখন অতগুলো কমলালেবু নিয়ে আসতে পেরেছে তখন নিশ্চয়ই সে জংগলের সব খোঁজ রাখে। তাকে দিয়েই বড় সাহেবকে যেমন করে হক পাকড়াও করতে হবে। নইলে মরবে ওরা? পলে পলে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মরবে? যেমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে নদীর ক্ষেপুনি এখন তো আর ছোট 'একানে' জাল পাওয়া যাবে না, বঁড়শিও ফেলা যাবে না আওড়ে। এতগুলো মানুষের জীবিকার উপায় হবে কি?

'আঞ্জু, আঞ্জু?'

'কে, হাওলাদার?' কাশেমের মুখের দিকে নজর পড়তেই আঞ্জুর বুকটা ছ্যাক্ করে ওঠে। যদিও সে একান্ত নিজের করে কাশেমকে পায়নি তবু আঞ্জুর স্থির থাকা দায়। দু একদিনের মধ্যে তার কাশেমকেও ছেড়ে যেতে হবে।

'ফরিদ কই?'

'ভাইজান তো আপনাগো খোঁজে নদীর পারের দিকে সকালে গেছে। বসেন হাওলাদার, আমি ডাইকা আনি।'

আঞ্জু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু ফরিদের কোন সন্ধান পায় না। অবশেষে সে কপালে করাঘাত করতে করতে ফিরে আসে। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও যেন একটু সুখ অনুভব করে। চর কাশেম ছেড়ে কোথাও তার তো যেতে হলো না।

কাশেম ভাবে, যে ডালে হাত দিচ্ছে সেই ডালই যখন ভেঙে যাচ্ছে তখন আর আশা নেই। অতলস্পর্শী খাদের আঁধারে ডুবে যেতে হবে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ে।

তবু দিন আসে দিন যায়। দুঃখের রাত্রি পর পর কেটে যায়। একটি শস্য কণিকাও আর কারুর গুপ্ত ভাণ্ডারে অবশিষ্ট নেই। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনগুলো কেমন করে যে কাটে তা আর প্রকাশ করা যায় না। দুনিয়ায় সব আছে—শুধু

আহার্য নেই। রাত্রে আর কেউ কারুর বাড়ি আসে না। গল্প-গুজব করার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। তার চেয়ে ভাল লাগে শুয়ে থাকতে।

একদিন কাশেমের হঠাৎ মনে পড়ে, জিজ্ঞাসা করে, শুঁটকি মাছ ?'

'তা এখনও আছে? শিথান দেও কোন শিয়রী ?' ফুলমন জবাব দেয়, 'মিঞার চেতন নাই !'

'হইছে কি ?'

'লুটপাট কইরা নিয়া গেছে।'

কাশেম ক্রুদ্ধ হয়। ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে, 'কেডা নেছে ?'

'সকলডি মিইলা। নেবে না, খাইবে কি ?'

'খাইবে কি !' খেঁকিয়ে ওঠে কাশেম—'খাইবে আমার মাথাডা। আমি কি কেওরে সাইধা আনছি এইখানে ?'

'সাইধা তো আনো নাই—সকলডি আইছে বুঝি গায়ের জ্বালায়? এখন একেবারে ভাল মানুষ সাজতে চাও—বলি দায় ঠেকলে অমন অনেকেই কয়।'

নিজের ঘা-টা ফুটে বের হয় ফুলমনের কথায়।

একখানা খন্তা নিয়ে কাশেম বেরিয়ে যায়। ফুলমন একটু চিন্তিত হয়। মানুষের মগজে ঘা লাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে দুয়ারের দিকে চেয়ে থেকে একটু উঠে বসে। যত সময় কাশেম না ফিরছে, তত সময় ওর সোয়াস্তি নেই। কি পাপই করেছিল ও !

কাশেম পোয়াখানেক ওজনের একখণ্ড মেটে আলু সংগ্রহ করে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ি ফেরে।

'ফুলমন সেদ্ধ করো।'

জোগাড়-যন্ত্র করে সিদ্ধ করার আগেই খানিকটা খেয়ে ফেলে কাশেম। ফুলমনের রাগ হয়। 'তবে ঘরে না আইনা কাঁচা খাইলেই পারতা !'

কাশেম লজ্জিত হয়—'না, না, আমার আর লাগবে না। তুমি ও টুক সিজাইয়া (সিদ্ধ করে) লও।'

ফুলমন আর কিছু জবাব দিতে পারে না।

২৪

আরো কদিন কাটে।

'হাওলাদার কি বাড়ি ?'

'ক্যান্ ?'

'গঞ্জের ব্যাপারীরা চাউল লইয়া আইছে।' হাফেজ বলে, 'যদি কও তবে তারা বাড়ির মধ্যে আইতে পারে। রাখবা নাকি ?'

'রাখুম না ? এ কথা আবার জিগান লাগে ? ডাইকা আনো।'

ব্যাপারী নয়—তার চেয়েও বড়—গঞ্জের মহাজনদের গোমস্তা। জগদীশের ছেলে এবং আর কে কে যেন একত্র হয়ে একে চরে পাঠিয়েছে, এরা যত ইচ্ছা চাল দিতে পারে—দর আশি টাকা। তবে এরা টাকা চায় না, চায় টিন ও কাঠ—অর্থাৎ ঘর কিনতে। দর-দস্তুর এদের মর্জি মত, কিন্তু চালের দাম বাঁধা। বেঁধে দিয়েছে গঞ্জের কর্তারা। তার ওপর নাকি গোমস্তার হাত নেই। চাল ঠিক ওর সঙ্গে নেই। দর-দাম কথাবার্তা স্থির হলে তারা ঘর ভেঙে নিয়ে যাবে, ফেরৎ নায়ে চাল দেবে পাঠিয়ে। বড় গোপনে এসব করতে হচ্ছে! সরকার টের পেলে নাকি রক্ষা নেই।

সব কথা শুনে কাশেমের ভীষণ রাগ হয়, মুখে কিছু বলে না।

হাফেজ বলে, 'কি মিঞা, কথা কও না যে ? এ সুবিধা আমি হইলে ছাড়তাম না ?'

'ছাড়তে কয় কেডা ? নিয়া যাও নিজের বাড়ি।'

'আমার কি ঘরে টিন আছে ?'

'আলগা কয়খান ? তাই বেচ গিয়া।'

'হাওলাদার কও তো—বুঝি সব, কিন্তু কইতে পারো জান বাঁচে কিসে ?'

তা তো বলতে পারে না কাশেম। তাই আবার চুপ করে থাকে। দুঃখ হয় হাফেজের আর্দ্র কণ্ঠে।

'বুড়া মহাজন কই ?' নিজেকে খানিকটা স্থির করে নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করে কাশেম, 'গোমস্তা মশাই —?'

'তিনি তীর্থে—বৃন্দাবন।'

'ঠাইনদি ?'

'তিনিও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাশেম মুখ ফিরিয়ে বসে।

'হাওলাদার, ঘর দিয়ে করবে কি, যদি ঘরে চালই না থাকল, মেয়েমানুষ উপোস করল ? ভেবে দেখ, আমরা ভাটা পর্যন্ত খালে আছি। প্রাণে বাঁচলে ও রকম ঘর কত তুলতে পারবে।' গোমস্তা আরও নানা ভাবে নানা নরম স্থানে

ঘা দিয়ে দেখে কাশেমের। সে যদি একটা লেনদেনও না করতে পারে তবে তারও যে সংসারের টান কুলায় না। চাকরি বজায় থাকবে কিসে?

দিন দিন ফুলমনের অবস্থা যেমন সংগীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে কাশেমকে একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কি করবে? বেচে ফেলবে নাকি ঘর? ওরা তো চলে গেল। আপাতত যদি রক্ষা পাওয়া যায়, ভবিষ্যতের কথা পরে ভাববে। এত আদরের ফুলমন আজ মুখ বুঁজে সব সইছে। কাশেম আর সইতে পারে না। পূর্বের অভ্যাস মত সে তাড়াতাড়ি উঠতে যায়। আর সে পারে না। তার হাত পা কাঁপতে থাকে তবু সে উঠবে, যাবে খালপার।

'কই যাও? অস্থির হইলা ক্যান্, মাথায় বুঝি শয়তান চাপছে?'

'না, না ফুলমন…তয় কি জানো…' থতমত খায় কাশেম।

'আমি সব জানি। মরলেও ঘরের তলে শুইয়া মরুম?' এই ঘরের জন্যও কি ফুলমন হাঁস মুরগী বেচে কম টাকা দিয়েছে, খেটেছে কম! 'তার থিকা থাইকা যাও—একান্তই যদি মরি দুইজনে, পাশাপাশি শুইয়া থাকুম—গোরস্তানটার চাইর পাশে গিয়া একটু মাটির আইল দেও। গাঙে তুফান দেইখা কূলে নাও ডুবামু না।' ফুলমন হাঁফাতে থাকে। ভাবে: এ দুনিয়ায় এ কোন্ শয়তানের রাজত্ব নেমে এল? তাদের সাধের ঘরবাড়ি যা কিছু ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। হায় খোদা!—তুমি কি নেই?

কাশেম কি যেন ভেবে উঠে দাঁড়ায়। শক্ত হাতে একটা একনালি টেনে আনে অনেক দিন বাদে। 'হাফেজ, এলাহি, লক্ষীন্দর—আসো তো ইদিকে। ব্যাটা গো টাইনা আনি।'

হাফেজ বলে, 'ক্যান?'

'ওগো নায়ে চাউল আছে।'

'এতক্ষণ বইয়া কি শোনলা? মিয়ার বুঝি মাথা খারাপ হইছে।'

কাশেম মাটিতে বসে পড়ে। সত্যিই তো সে ভুল করছে!

তারপর আরও প্রায় একটা মাস কেটে গেছে। পূর্ণিমা এসে চরটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্নার প্লাবনে। বারান্দার পাটাতনে শুয়ে একটা সুগন্ধ পাচ্ছে কাশেম। ওঠার শক্তি নেই, কিন্তু ঘ্রাণ-শক্তি এখনও নষ্ট হয়নি। তার বেল ফুলের ঝাড়ে ফুল ফুটেছে। সহস্র তারা ঝিলমিল করছে নীল আকাশে। কাশেমের চেয়ে অনেক বেশি অশক্ত হয়ে পড়েছে ফুলমন। একটি শস্যকণাও

পেটে পড়েনি আজ। এতবড় একটা চরের হাওলাদার এবং তার বিবি আজ শুধু পানি খেয়েছে।

চরে শুধু আছে আঞ্জু রসময় ও কাশেমরা স্বামী-স্ত্রীতে। আর সব একে একে পালিয়েছে। কেউ গেছে আত্মীয়বাড়ি, কেউ গেছে একেবারে দক্ষিণে, কেউ বা গেছে গঞ্জে ভিক্ষা করতে। কারো ঘর পড়ে আছে, কেউ বা টিন-কাঠ বেচে খেয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে পথে নেমেছে। এত বড় চরটা পাহারা দিচ্ছে যেন এই চারটা প্রেতাত্মা। রসময়ের স্ত্রী মারা গেছে অজীর্ণ রোগে গত সপ্তাহে।

একটা অবুঝ কোকিল ডাকে। দমকা হাওয়ায় আসে ফুলের গন্ধ ভেসে—জ্যোৎস্নার জোয়ারে চরটা যেন স্নান করেছে। কেমন একটা নিস্তেজ অনুভূতিপূর্ণ তন্দ্রায় কাশেম চোখ বোঁজে। ডুবন্ত মানুষের চোখে যেমন সারা জীবনটা ছায়াছবির মত ভেসে ওঠে, কাশেমের চোখেও তাদের এমন রাত্রির মধুর দিনগুলির কথা ভেসে ওঠে।

কাশেম ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়। ফুলের গন্ধে যেন আজ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাবে তার। শক্তি নেই যে উঠে ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেলবে।

তবু আবার ভাল লাগে সুগন্ধ। আবার গত জীবনের ঘটনার মত যেন মনে পড়ে বিস্মৃতির স্মৃতি।

ফুলমন হামাগুড়ি দিয়ে কাশেমের কাছে এসে শুয়ে পড়ে। সে হাঁফাচ্ছে। চেহারা হয়েছে প্রেতিনীর মত।

ধীরে ধীরে কাশেম ফুলমনের একখানা বিশীর্ণ হাত বুকে টেনে এনে বলে, 'তুমি তখন যদি চাচার সাথে বাড়ি যাইতা!'

ফুলমন ধরা গলায় জবাব দেয়, 'তুমি আজও একথা কও হাওলাদার। তুমি আমি মরনে বাঁচনে পাশাপাশিই থাকুম—চরকাশেম আমরা ছাড়ুম না। এ্যাদ্দিনেও পরাণের কথাডা আমার বুঝ্‌লা না?'

কাশেম তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে ফুলমনের কথা শোনে। কথা ফুরিয়ে যায় তবু তার রেশ যেন কিছুতেই ফুরাতে চায় না। সে চুপ করে শুয়ে থাকে।

কে যেন ডাকে—

'কাশেম কি বাড়ি আছো?'

'কে?' ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন হয়।

'আমি জীবন পিওন।' বলতে বলতে জীবন এসে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। বহু দূরদূরান্তর ঘুরে সে আশ্রয়ের জন্য এখানে এসেছে। পথে দশটাও কি গ্রাম পড়েনি কিন্তু সেখানে রাত্রিবাস অসম্ভব।

কাশেম হাত দিয়ে ইসারা করে বসতে বলে।

জীবন উঠে বসে। এখন সে যথেষ্ট প্রাচীন হয়েছে, তবু চাকরি ছাড়েনি—কেমন করে কৌশলে যেন টিকে রয়েছে। এখন বেরিয়েছে বাকি-বকেয়ার নোটিশ নিয়ে।

একটু একটু করে জীবন সব শোনে। এগিয়ে গিয়ে রসময়কে শিশুর মত কোলে তুলে কাশেমের দাওয়ায় নিয়ে আসে। আঞ্জুকেও আনে। রসময় যেন কি খুঁজছে? 'হর-গৌরী?'

জীবন উঠে গিয়ে রসময়ের শয্যা থোক পিতলের যুগল দেব মূর্তিখানা খুঁজে এনে ওর হাতে দেয়। একটু যেন সুস্থ হয় রসময়।

জীবনকে দেখে কত কথা উথলে ওঠে রসময় ও কাশেমের মনে। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করার আগে যেন আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসে সকলের চৈতন্য। জীবনও আর বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করে না। সে এখন আর অন্য সকলের ভরসায় পথ চলে না। সঙ্গে তার কিছু আহার্য থাকে। সে তার ঝুলি উবুড় করে সব চাল ঢালে। অতি কষ্টে উনান জ্বালায়। ভাত চড়াতে গিয়ে দেখে যে হাঁড়িটা নেই। রান্নাঘরেও এত আবর্জনা যেন মনে হয় অনেক দিন এমুখো হয়নি কেউ। উঠানে একটা সাধারণ উনুন কোনমতে খুঁড়ে নিয়ে সে একটা হাঁড়ি চেয়ে আনে ফুলমনের কাছ থেকে। আগের হাঁড়িটা হয়ত শেয়ালে নিয়ে গিয়ে কোন্ বন-বাদাড়ে ফেলেছে। দৃষ্টি দেবার তো কেউ নেই।

অনেক কষ্ট করে জীবন ফ্যানাভাত নামায়। তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে গেছে। সে চারটা মেটে বাসনে ভাতগুলো সমান ভাগে ভাগ করে রাখে।

ভাতের গন্ধে রসময় ছাড়া সকলে উঠে বসে। ফুলমন বারান্দায় এগিয়ে আসে। তার ফুটন্ত ফুলের মত যৌবন যেন অকালে শুকিয়ে গেছে। চোখের কোলে বসেছে গভীর কালো দাগ।

চারজনের কাছে চার বাটি ভাত এগিয়ে দেয় জীবন। রসময়কে দিতে হয় খাইয়ে। সকলের মতই রসময় ভাবে: যখন জীবন এসেছে তখন এ যাত্রা

রক্ষা করবেন তার হর-গৌরী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জীবনের প্রথম দিনের কথা' 'সব গরিবের হুক্কা এক করতে হইবে।'

খেয়ে-দেয়ে সকলে একটু সুস্থ হয়। এতগুলো উপোসের পর আর বেশি কেউ খেতে পারে না। অবশিষ্ট যা থাকে খায় জীবন। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে সকলের কাছে এসে বসে। তামাক নেই, বিড়ি রয়েছে। তিনটা ধরিয়ে এগিয়ে দেয় তিন জনকে।

এঁটো বাসনগুলোর কথা জীবনের মনে ছিল। সে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে আবার ঘাটের দিকে যায়।

আঞ্জু ও ফুলমনের শক্তি নেই তবু যেন লজ্জা বোধ করে।

জীবন বুঝতে পারে ওদের মনের ভাব। বলে, 'মা লক্ষীরা এ্যায়ছা দিন নেহি রহেগা। লজ্জা কিসের?'

ঘাট থেকে ফিরে এসে জীবন জিজ্ঞাসা করে, 'হাফেজ? সেও কি—'

রসময় ধীরে ধীরে জবাব দেয়, 'মরেনি। টিন কখানা বেচে দেশান্তরে গেছে?'

'শান্তি? রজনী?'

'দক্ষিণে—কুটুম বাড়ি।'

'আর যারা?'

'হাটে, বন্দরে, যে যেদিকে পারে।' রসময় নিজের মনে মনে এবার বলে, 'এত বড় চরটা ছারখার হয়ে গেল, একি কম দুঃখের কথা!'

'আবার সব ফিরা আইবে দাস মশয়, কেও মরে নাই। কাশেম বলে 'বেড়াইতে গেছে, বেড়াইতে গেছে সব।'

জীবন বলে, 'ভাবিস না কাশেম, তোর চর আবার ভইরা ওঠবে, আইবে সক্কলে ফিইরা।'

'সেই আশায়ই তো এখনও মরি নাই, কিন্তু—'

রসময় মন্তব্য করে, 'এবার বুঝি ভাতের অভাবে মরবি? না রে, না, সে চিন্তা আর আমি করিনে যখন হালদারের পো এসেছেন।'

রাত প্রায় আড়াই প্রহর। জীবন সকলকে বিশ্রাম করতে বলে। সে উঠে নিজের জন্য একটু স্থান করে নেয়। বিছানা-পত্র তো সঙ্গেই রয়েছে। সে একটা বিড়ি ধরিয়ে কাশেমের কাছে এসে বলে, 'কালই কাশেম জেলায় যাবি আমার সঙ্গে?'

'ক্যান?'

'কাজ আছে, নাওগুলা তো ধরে নাই ?'

'না। খাড়িতে ডুবাইয়া রাখছি গোপনে।'

'তয় চল কালই। দেখি যদি কিছু করতে পারি।'

'কি করবেন ? করবার আছে কি ?'

'দু একখানা পাশ দিতে পারে জাইলা ডিঙির।'

'কন কি ! দিবে না।'

'তবু যাওয়া লাগবে কাশেম।'

'ক্যান্ ?'

'পিরীতবাদ করতে।'

'যদি পিরতিকার না হয় ?'

'তবু যেতে হবে।' রসময় সহসা উঠে বসে, 'তোর চিন্তা নেই আমিও যাব।'

কাশেম হৃদয়ে একটা বল বোধ করে। কিন্তু বুঝতে পারে না কি শক্তির তেজে জ্বলে উঠে নিস্তেজ শিখা।

জীবন বার বার বলে যে, প্রতিকার না হলেও প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের। মাথা পেতে সইলেই অন্যায় আরও উদ্ধত হয়ে ঘা মারবে।

উপোসী চোখগুলো হঠাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে। কি যেন বার্তা শুনেছে মহান ! কি যেন পথ দেখেছে অন্ধকারে !

জীবন আবার বলে, ভোর হলেই একখানা নৌকা ভাড়া করবে, নয়ত ডোঙা জোটাবে আট দশখান। যাকে পাবে তাকে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে জেলায় যাবে। প্রতিকার না হলেও প্রতিবাদ করতে ছাড়বে না।

উপোসীরা বলে, ঠিক হালদার মশাই ঠিক !—ওরা যেন মেরুদণ্ড সোজা করে ওঠে। ক্রমে রাত শেষ হয়ে আসে।

দূর নদী বক্ষ থেকে একটা প্রতিধ্বনি ভেসে আসে—যেতে হবে, যেতে হবে, একটা কঙ্কালকেও আজ আশা বুকে নিয়ে মাথা খাড়া করে প্রতিবাদ করতে যেতে হবে !